সিআইপিডি'র
রজত জয়ন্তী
স্মারকগ্রন্থ

CIPD

Estd: 10 May, 1998

সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CIPD)

টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি-৪৫০০, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

Website: www.cipdauk.org, ইমেইল ঃ cipdcht@gmail.com, ফোন ঃ ০২৩৩৩৩৭২০৭৬

সিআইপিডি'র

রজতজয়ন্তী

স্মারক গ্রন্থ

CIPD

Estd: 10 May, 1998

সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CIPD)

টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি-৪৫০০, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

Website: www.cipdauk.org, ইমেইল ঃ cipdcht@gmail.com, ফোন ঃ ০২৩৩৩৩৭২০৭৬

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবায়
CIPD' র ২৫ বৎসর পূর্তি

স্মারকগ্রন্থ

প্রকাশকাল
১৭ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা পর্ষদ
মংসানু চৌধুরী
নিরূপা দেওয়ান
এঞ্জেলা দেওয়ান
যশেশ্বর চাকমা

সম্পাদনা পর্ষদ
জনলাল চাকমা
সুখেশ্বর চাকমা
মন্টি দেওয়ান
ভেটায়্যান চাকমা
সুশান্তি চাকমা

প্রচ্ছদ ছবি জন্য কৃতজ্ঞতা
সঞ্চয় চাকমা (Chwla Bap)

বর্ণবিন্যাস
শান্তি চাকমা

মুদ্রণ
সীবলী অফসেট প্রেস,
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী
রাঙ্গামাটি।

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী

ALOKITO	Alternative Livelihood Options with Knowledge, Input and Training in Alekkhong
ARAD	Action Research on Alternative Development
EED	Evangelischer Entwicklungsdienst
BftW	Bread for the World.
BFF	Bangladesh Freedom Foundation
BIPNet	Bangladesh Indigenous Peoples Network of Climate Change and Biodiversity.
BMSC	Bangladesh Marma Students Council.
BRC-CHT	Birth Registration of Children in the remote areas of CHT.
BTSWF	Bangladesh Tanchangya Student Welfare Forum .
CE&ED	Community Empowerment & Economic Development
CHT	Chittagong Hill Tracts
CHTDB	Chittagong Hill Tracts Development Board
CHOLEN	CHT Children's Opportunity for Learning Enhanced
CHTRC	Chittagong Hill Tracts Regional Council
CHTDF	Chittagong Hill Tracts Development Facility
CIPD	Centre for Integrated Programme and Development
CMWSP	Community Managed Water and Sanitation Project
DPS	Deep Pump System
DWA	Department of Women Affairs.
EAPP	Enhancement of Agri-production, Processing and Preservation
EFA	Expanded Food Assistance
EJCPC	Empowerment of Jumia Community And Promotion of Culture.
EIA	Environmental Impact Assessment
ENRICH	Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Proverty
FFS	Farmer Field School
HDCs	Hill District Councils
HFP	Homestead Food Production
HKI	Helen Keller International
IGA	Income Generating Activities
IRG	International Resources Group
IPAC	Integrated Protected Area Co-Management
LCP	Local Capacities for Peace.
MJF	Manusher Jonno Foundation
MRA	Microcredit Regulatory Authority
NGO	Non Governmental Organization
PCJSS	Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti
PEARL	People's Empowerment for Accessing Rights to Livelihoods
PDC	Para Development Committee
PKSF	Palli Karma Sahayak Foundation
PNDG	Para Nari Development Group
RHDC	Rangamati Hill District Council
RMP	Rural Road Maintenance Programme
RCRP	Rodent Crisis Recovery Programme
SAFANSI	South Asian Food and Nutrition Security Initiative
TSF	Tripura Students Forum
UNO	Upazila Nirbahi Officer
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
USAID	United States Agency for International Development.
UP	Union Parishad
WFP	World Food Programme
WRN	Women Resource Network
VDC	Village Development Committee
VOTE-CHT	Vote Education for CHT Rural Community.
VGD	Vulnerable Group Development.
VMF	Village Model Farm

সাধারণ সম্পাদকের দু'টি কথা.....

পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে দেশের অন্যতম পশ্চাৎপদ অঞ্চল। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য কারণে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। জুমচাষ এখনো অন্যতম কৃষি ব্যবস্থা। এ অঞ্চল শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যেমন পিছিয়ে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দুর্গমতার কারণে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতও অত্যন্ত সীমিত। বিগত শতাব্দী পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও বিকাশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল অবরুদ্ধ। বৃটিশ আমলে ছিল সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, পাকিস্তান আমলে ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং ১৯৭৫ সাল পরবর্তী দেখা দেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা।

১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" স্বাক্ষরের আগে এ অঞ্চলে সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম ছিল সীমিত এবং বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের কোনো সুযোগই ছিল না। চুক্তি পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জননিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার উন্নয়ন ঘটলে বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বার খুলে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার। শান্তিচুক্তি পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান ও সমমনা কিছু ব্যক্তি অনুধাবন করেন, অনুকূল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে ও এলাকায় সরকারি সেবা-সুবিধা পৌঁছে না সে সব ক্ষেত্রে ও এলাকায় বেসরকারি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন "আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্র" বা ইংরেজিতে Centre for Indigenous People's Development (CIPD) নামে এই সংগঠনটি।

২০০৭ সালে শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান CIPD এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন এবং ৩০ এপ্রিল ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী ধনঞ্জয় চাকমা প্রয়াত হন। ২০১১ সালে পরিবর্তিত পরিস্থিতে সংস্থা তার সংক্ষিপ্ত নাম CIPD অপরিবর্তিত রেখে Centre for Indigenous People's Development-এর পরিবর্তে Centre for Integrated Programme and Development পরিবর্তন করা হয়। CIPD এখনো একই লক্ষ্য ও আদর্শে অবিচল থেকে বহন করে চলেছে উত্তরাধিকার। ১০ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, একই ধারাবাহিকতায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবায় CIPD অতিক্রম করলো দীর্ঘ পথচলার ২৫ বছর।

CIPD এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশন, নারী ক্ষমতায়ন, গৃহায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মাতৃভাষা শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন, গবেষণা, প্রকাশনা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি মাত্র ২৯,০৯৬ জন প্রত্যক্ষ সুফলভোগী ও ২৮,১২৩ পরিবারের কাছে। তাঁর বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে এই ২৫ বৎসর পূর্তি স্মারকগ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে পৌঁছতে পারিনি আরো অনেক সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কাছে। আগামীতে সেসব জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই দীর্ঘ যাত্রায় স্মরণ করছি CIPD এর স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রী রূপায়ণ দেওয়ানকে, যাঁর অক্লান্ত শ্রম ও মেধা ছাড়া CIPD এ পর্যায়ে আসতে পারতো না। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা যাঁদের হারিয়েছি- CIPD এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী ধনঞ্জয় চাকমা (২০০৮), CIPD এর সদস্য শ্রী বিমলেন্দু চাকমা (২০১৫), শ্রী গৌতম মুনি চাকমা (২০১২), শ্রী স্মৃতি ভূষণ চাকমা (২০১৫) ও শ্রী আশুতোষ তালুকদারকে (২০১৫)। ২০১৭ সালের ভূমিধস দূর্যোগে আরো হারিয়েছি আমাদের নিরলস কর্মী হ্যাপী চাকমাকে। আজ এই রজতজয়ন্তীতে আমরা তাঁদের স্মরণ করছি।

কৃতজ্ঞতার সাথে আরো স্মরণ করছি, এই দীর্ঘ যাত্রায় যে সব দাতাগোষ্ঠী, প্রশাসনসহ সকল অংশীজন ও শুভাকাঙ্ক্ষি যাঁরা CIPD এর পাশে ছিলেন এবং আছেন। CIPD এর আদর্শে অবিচল থেকে যাঁরা পেশাদারিত্বের সাথে এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সাথে CIPD এর লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সুখেশ্বর চাকমা
সাধারণ সম্পাদক

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়- রাঙ্গামাটি
ফোনঃ +৮৮০ ২৩৩ ৩৩৭১ ৬৯৩, (অ): +৮৮০ ২৩৩ ৩৩৭২ ১৪৩ (বা)
ফ্যাক্সঃ +৮৮০ ২৩৩ ৩৩৭১ ৬৪০
ই-মেইলঃ chtrc@yahoo.com, ওয়েবঃ www.chtrc.gov.bd

শুভেচ্ছা বাণী

সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)- এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সিআইপিডি গবেষণা, এডভোকেসি, দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সিআইপিডি- এর উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা রাখি।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

অংসুই প্রু চৌধুরী
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬৩১৩২, ৬৩১৪৭, ৬৩২৭০
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৩৫১-৬২১৯২

শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সরকারিভাবে উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থা রাঙ্গামাটি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং এলাকার মানুষের জীবিকা উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলি পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছে।

রাঙ্গামাটি জেলার অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি) ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে গবেষণা, এডভোকেসি, দারিদ্র্য বিমোচন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং এখনও বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

আমি আশা করি সিআইপিডি'র এই উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা চলমান থাকার মাধ্যমে সরকারি বেসরকারিভাবে এ জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে সিআইপিডি'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(অংসুই প্রু চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

RUPAYAN DEWAN
Member, Chittagong Hill Tracts Regional Council
Rangamati, Bangladesh
Resource Person on Chittagong Hill Tracts Issues.
Cell: +880-1550608315, E-mail: rupryan.dewan@gmail.com

শুভেচ্ছা বাণী

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সিআইপিডি তার সিকি শতাব্দী অতিক্রান্ত করতে পারবে– এ বিষয়ে আমার কোনো সংশয় ছিল না। তার কারণ– সংস্থাটিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি পরিচালনার ক্ষেত্রে নমনীয় কৌশলী নীতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং, সৎ ও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করার পাশাপাশি সাধারণ পরিষদের আকারও সীমিত রাখা হয়েছিল।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই, সিআইপিডি অবশেষে রজতজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে– এটা সংশ্লিষ্ট সবার– বিশেষ করে যাঁরা প্রথম কার্য পরিষদে ছিলেন- তাঁদের। উল্লেখ করা দরকার, অনিবার্য্য কারণে ২০০৭ সনে সুদীর্ঘকালের জন্য সিআইপিডি-র সঙ্গে আমার কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও আমি আনন্দিত যে, সিআইপিডি আমার লেগাসি বহন করছে।

জীবনের নতুন গতিপথে জনসম্পৃক্ততা ও জনসেবা অব্যাহত রাখতে আমার সুগভীর ভাবনার ফসল হচ্ছে সিআইপিডি। শান্তিসংলাপ প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠা আন্তরিকতার সুদৃঢ় বন্ধনের সুবাদে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন– পদ্মায় জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ও জনাব জুলফিকার আলী অবহিত হলে তাঁরা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

বন্ধুস্থানীয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সাজ্জাদ জহির লেলিনের আগ্রহে এক বৎসর মেয়াদী গ্রামীণ ট্রাষ্ট এর উদার গবেষণা তহবিল নিঃসন্দেহে সিআইপিডি-কে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। অনুরূপভাবে– আদিবাসী, জাতিসংঘ সিষ্টেম, মানবাধিকার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং বন্ধুস্থানীয় ফিলিপাইনের মিজ ভিক্টোরিয়া টি. করপুজ এর অন্য একটি গবেষণায় অর্থায়ন সিআইপিডি-র এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্তির পথ করে দেয়।

অত্যন্ত গৌরববোধ করি– সিআইপিডি গবেষণা দিয়ে তার অগ্রযাত্রা শুরু করেছে এবং বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা কর্ম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সৃজনশীল কর্মসম্ভার সমৃদ্ধ করেছে। ১৪টির অধিক সেক্টরে সিআইপিডি প্রভূত কাজ করেছে বলে আনন্দে আমার বুক ভরে যায়। তবে, দুঃখ লাগে, অনিবার্য কারণে সিআইপিডি অনেক কাজ করতে পারেনি বলে।

সিআইপিডি-র রজতজয়ন্তী সমারোহে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের আনন্দের সমভাগী হতে চাই। প্রতিষ্ঠালগ্নের সহসাথীদের আন্তরিক শুভকামনা জানাই। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠালগ্নের সহসাথী প্রয়াত ধনঞ্জয় চাকমা ও প্রয়াত বিমলেন্দু চাকমাকে পরম শ্রদ্ধা জানাই। অধিকার হারা ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে সিআইপিডি অধিকতর পাশে থাকবে– এ প্রত্যাশা রেখে সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহ পর্যন্ত যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের জন্য থাকলো আন্তরিক শুভকামনা। সবশেষে– সিআইপিডি-র দীর্ঘ পদযাত্রার জন্য থাকলো অনেক অনেক শুভকামনা।

(রূপায়ণ দেওয়ান)
২৬ এপ্রিল ২০২৩

সভাপতি'র শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) জাতিগত গঠন, ভৌগলিক পরিবেশ এবং জনগণের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দেশের সব অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। চরম দারিদ্র্য, স্বল্প স্বাক্ষরতা, দুর্গম যোগাযোগ, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং জাতিগত সংঘাত ইত্যাদি কারণে বিগত শতকের শেষ তিন দশক পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল পশ্চাৎপদ ও অস্থিতিশীল। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি উত্তরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS) এর মধ্যে ঐতিহাসিক "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" স্বাক্ষরিত হলে স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) জাতিগত গঠন, ভৌগলিক পরিবেশ, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিক থেকে সকল জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য একই রকম। তাদের সংস্কৃতিও অনেকটাই জুম কেন্দ্রিক। তাদের গান, নৃত্য, লোক-কথা, সঙ্গীত, এমনকি সাহিত্য সবই জুম অর্থনীতির গভীরে প্রোথিত।

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে জুম্মদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পুষ্টি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে সমাধান করা প্রয়োজন। বিগত ২৫ বৎসরে CIPD কমিউনিটির ক্ষমতায়নে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের পথে সকল বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছে বলে মনে করি এবং সুবিধা বঞ্চিত কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এরূপ সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুক্ত থাকলেও সভাপতির পদের দায়িত্ব পালন একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা।

চেয়ারপারসন হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে CIPD-এর সম্মানিত উপদেষ্টা, সাধারণ এবং কার্যনির্বাহী সকল সদস্যদের তাঁদের সক্রিয় সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমি তাই, সিআইপিডির আড়াই দশকের ঘটনাবহুল যাত্রা উদযাপন উপলক্ষ্যে, সমস্ত কর্মী, সদস্য, আমাদের সম্মানিত বন্ধু, দাতা সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই এই দীর্ঘ যাত্রার সিআইপিডিকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

অর্ণব চাকমা
সভাপতি

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ডেস্ক থেকে

একটি সংস্থার জীবনকালে ২৫ বৎসর যেমন খুব বেশি সময় নয়, তেমনি খুব কম সময়ও নয়। শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে এনজিও কার্যক্রমে জড়িত হয়ে আমার জীবনের বিগত ২৫ বৎসর এনজিও কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা অর্জনের এক বিরাট মোক্ষম কাল। CIPD'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক-২০০৩-২০১৩) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বিভিন্ন বাঁধা-বিপত্তি ও সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী, দাতা সংস্থা, সরকারি প্রশাসন, সংস্থার সদস্য, অভ্যন্তরীণ কর্মী পরিচালনা, অর্থ সংকট মোকাবেলা তথা সংস্থার কাজে এমনভাবে জড়িত ছিলাম যে, আমার জীবন থেকে এই ২৫ বৎসর যে কখন শেষ হলো বুঝতে পারিনি, মনে হচ্ছে যেন অতি দ্রুত শেষ হয়েছে।

আজ বড় আনন্দবোধ করছি সকলকে নিয়ে এমন একটি দিন উদযাপন করতে যাচ্ছি। আবার দুঃখবোধও করছি প্রথম থেকে যাঁদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম আজ তাঁরা অনেকে নেই। যাঁরা জাগতিক নিয়মে ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে চলে গেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই ও সদগতি কামনা করি। আর যাঁরা আমাদের কার্যক্রমের বাহিরে আছেন (সদস্য, সহযোগী, কর্মী) সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যে কোনো কাজের মূল্যায়ন হয় অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চুড়ান্ত ফলাফলে। বিগত ২৫ বৎসরে CIPD যে সেবা প্রদান করেছে ও যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তার পরিমাপ করবেন সেবাগ্রাহী সুফলভোগীগণ, প্রকল্পের সফলতা মূল্যায়ন করবেন দাতা ও দাতা সংস্থা, যার প্রতিফলন ঘটবে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে। CIPD শুধু তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে কাজ সম্পাদন করেছে। আমরা শুধু বলতে পারি CIPD অত্যন্ত সততার সাথে কাজ করেছে।

এটা বিদিত যে, যে কোনো কাজ শুরু করা সহজ কিন্তু সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কঠিন। তেমনি যে কোনো সংস্থা গঠন করা সহজ কিন্তু টিকিয়ে রাখা কঠিন। তিন পার্বত্য জেলায় গঠিত শতাধিক স্থানীয় এনজিওসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে এই বাস্তবতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। CIPD এর ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করি।

পরিশেষে আমি বিগত ২৫ বৎসরের কার্যক্রমে জড়িত CIPD এর অংশীদার, দাতা সংস্থা, নেটওর্য়াক সদস্য, সংস্থার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সদস্য, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য। আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিও কৃতজ্ঞ যাঁরা আমাদের কর্মসূচির বাস্তবায়নকে নিরাপদ করতে সহায়তা করেছেন এবং আরও ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মীদের যাঁরা আজ পর্যন্ত এই সংস্থায় কাজ করছেন যাঁদের নিরন্তর ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া CIPD এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারত না।

এই বিশেষ দিনে আমি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদেরও স্মরণ করছি যাঁরা সংগঠনের সাথে থাকা পর্যন্ত অনেক সহযোগিতা করেছিলেন।

জনলাল চাকমা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু সমূহ	পৃষ্ঠা
পটভূমি, ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য	১১
প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি	১২
নারীর ক্ষমতায়ন	১৪
খাবার পানি ও স্যানিটেশন	১৫
প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১৭
পুষ্টি কার্যক্রম	১৮
সমৃদ্ধি প্রকল্পের বিবিধ কার্যক্রম	১৯
বিকল্প উন্নয়ন	২২
সামাজিক শান্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	২৩
ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম	২৪
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এবং হল উদ্বোধন	২৫
পরিদর্শন	২৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২৮
দারিদ্র্য বিমোচন	৩০
খাদ্য নিরাপত্তা	৩২
গবেষণা ও প্রকাশনা	৩৪
সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ সম্মাননা প্রদান	৩৬
সিআইপিডি'র আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার ফটোগ্যালারি	৪০
উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ (২০২২-২০২৫) এবং পরলোকগত সদস্য	৪১
প্রাক্তন সদস্য ও নির্বাহী পরিষদ (১৯৯৯-২০২৫)	৪২
অর্গানোগ্রাম	৪৩
চলমান প্রকল্প	৪৪
বাস্তবায়িত প্রকল্প	৪৫
রেজিস্ট্রেশন ও কার্যালয়	৪৭
সিটিজেন্‌স চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)	৪৮
প্রবন্ধ-	
১। স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকা- মংসানু চৌধুরী	৫০
২। পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রম: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা- অম্লান চাকমা	৫২
৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সিআইপিডি একটি অগ্রগামী সংস্থার নাম- অশোক কুমার চাকমা	৫৬
৪। বিকল্প উন্নয়ন ধারণা: পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ জীবন রূপান্তরের জন্য একটি কর্মগবেষণা প্রক্রিয়া- দীপোজ্জল খীসা	৫৮
৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা- জনলাল চাকমা	৬৩

পটভূমিঃ

বার্ষিক সভা- ২০১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ববর্তী সময়ে তিন পার্বত্য জেলায় অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ থাকায় সকল ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে এনজিও কার্যক্রম চালানোর তেমন পরিবেশ ছিল না। এই সময়ে এখানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কেবলমাত্র অধিক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ এলাকায় শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সীমিতভাবে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে অনেক জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও এখানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর CIPD গবেষণা, এডভোকেসি, দারিদ্র্য বিমোচন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সেক্টরে কাজ করছে। বিগত ২০০১-২০২২ সালের মধ্যে CIPD দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ও বর্তমানে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ভিশনঃ

প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন

পার্বত্য এলাকা একটি পার্বত্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রথাগত স্ব-শাসিত অঞ্চল, যা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অর্থনৈতিক-ভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী। যেখানে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সহভাগিতার মূল্যবোধ ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ বিরাজমান ও জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং নারী-পুরুষ সমতা ও মর্যাদার সহিত বসবাস করছে।

মিশনঃ

পার্বত্য এলাকার স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নারী পুরুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করা। প্রথাগত জ্ঞানের বিকাশ, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং নারী পুরুষের সমঅধিকারের চেতনাকে বিস্তৃত করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. পার্বত্য অঞ্চলের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;

২. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সদব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা;

৩. নারী-পুরুষের মধ্যে মানবিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মর্যাদার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সমতা আনয়ন করা;

৪. সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা রক্ষা ও বিকাশ করা;

৫. গবেষণা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।

CIPD এর ২৫ বছরঃ বাস্তবায়িত প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি

ক। সমৃদ্ধি (ENRICH) প্রকল্পে বৈকালিক শিক্ষা কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ঝড়েপড়া রোধ ও মানোন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধি (ENRICH) প্রকল্পে সাপছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দৈনিক দুই ঘন্টাব্যাপী পাঠদান করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে পাড়া ভিত্তিক ২৫টি শিক্ষাকেন্দ্রে বৈকালিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বৈকালিক পাঠদান কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২,৬৬৯ ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করা হয়েছে। বিশেষত, নিরক্ষর অভিভাবকের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এই কার্যক্রম অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ে যা কিছু পড়ানো হয় বৈকালিক পাঠদান ক্লাসে তাদের মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার কারণে ঘাটতি পূরণে সহায়ক হয়। নিরক্ষর অভিভাবকরা যেখানে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠে সহায়তা করতে অক্ষম, সেখানে বৈকালিক পাঠদানের ক্লাস সেই অভাব পূরণ করছে। CIPD এর মনিটরিং ও মূল্যায়নে দেখা যায়, বৈকালিক পাঠদান ক্লাসে যারা অংশগ্রহণ করে তারা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে এবং ঝড়ে পড়ে না। ২০১৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে ১ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১১ জন ১ম স্থান ও ১০ জন ২য় স্থান ও ৯ জন ৩য় স্থান এবং ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৮২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯ জন ১ম স্থান ও ৮ জন ২য় স্থান ও ৭ জন ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

বৈকালিক কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী

খ। CHOLEN (২০০১-২০০৫)

কেয়ার-বাংলাদেশ এর সহায়তায় CIPD বাঘাইছড়ি উপজেলায় CHT Children's Opportunities for Learing Enhanced (CHOLEN) প্রকল্প (২০০১-২০০৫) বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পে প্রাইমারি টার্গেট হিসাবে ৫টি ও সেকেণ্ডারি টার্গেট হিসাবে ১০টি মোট ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২,১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাইমারি টার্গেট- ১. কচুছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২. দুরছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩. নব পেরাছড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪. তাংগুম মুখ কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫. পশ্চিম খেদারমারা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় । সেকেণ্ডারি টার্গেট- ১. চিন্তারাম ছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় , ২. খেদারমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩. মোরঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪. নলবনিয়া স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫. রাঙ্গা দুরছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬. সারোয়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭. উগলছড়ি মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮. মধ্যম উগলছড়ি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯. উত্তর খাগড়াছড়ি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০. দক্ষিণ পাবলাখালী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য স্কুলগৃহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ, প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ, জুমিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ও খেলাধূলা সামগ্রী প্রদান এবং স্কুল পরিচালনা কমিটি সক্রিয়করণ ও মা দল গঠন করে অভিভাবকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সম্পৃক্ত করা হয়।

মেধাবী মেনন চাকমার শৈশব থেকে স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার, তাঁর স্বপ্ন পূরণে CIPD এর বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি

মেনন চাকমা বলেন "শৈশব থেকে আমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন, ডাক্তার হয়ে জনসেবা করবো। কিন্তু, মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ভর্তির সুযোগ পেয়েও যখন আমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পথে, তখন CIPD সহযোগিতার হাত বাড়ায়। **CIPD** আমাকে দারিদ্র্যতার কাছে হেরে যেতে দেয়নি।"

মেনন চাকমা

তাঁর পিতা নিকেল চাকমা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের ভারবোচাপ গ্রামের বাসিন্দা। একমাত্র ছেলের লেখা-পড়ার সুবিধার্থে চট্টগ্রামের সাইডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির চাকুরী বেছে নেন। তাঁর ১ম সন্তান মেনন চাকমা পূর্ব নাসিরাবাদ এ জলিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ গ্রেডে জেএসসি ও এসএসসি উত্তীর্ণ হন। এরপর ২০২০ সালে চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পান। কিন্তু তার চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারি পিতার পক্ষে মেনন চাকমাকে এমবিবিএস পড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। মেনন চাকমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে সফল করতে CIPD ২০২২ সালে তাকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে মনোনীত করে। এই বৃত্তির জন্য মনোনীত হওয়ার পর মেনন চাকমা'র বাবা বলেন "CIPD'র সহযোগিতায় আমার ছেলের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে, আমরা CIPD'র নিকট চির কৃতজ্ঞ।"

বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ২০২২

গ। শিক্ষাবৃত্তি

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে CIPD নিজস্ব তহবিল থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সাধারণ বৃত্তির আওতায় দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ বৃত্তি ও ১ জন এমবিবিএস ক্লাসের ছাত্রকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছে। এছাড়াও PKSF এর সহায়তায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

ক। গ্রামীণ নারী দক্ষতা বৃদ্ধি-২০০৫-২০০৮

নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে CIPD প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউণ্ডেশনের (BFF) অর্থায়নে "গ্রামীণ নারী দক্ষতা বৃদ্ধি" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় এনজিওসমূহ কর্তৃক মনোনীত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খুমী, বম, পাংখোয়া ও খিয়াং জনগোষ্ঠীর নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি ব্যাচে ১২ জন করে ২০০৫-২০০৮ সালের মধ্যে মোট ১০৮ জন নারীকে ট্রেনিং অব ট্রেনারস্, অফিস পরিচালনা, জেন্ডার ও নারী ক্ষমতায়ন, শিশু ও নারী অধিকার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি, এনজিও ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কার্যক্রম, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং উপস্থিত ছিলেন মিজ রিতা চাকমা (WFP), মিজ হেলী (CHTDF, UNDP) ও ড. মানিক লাল দেওয়ান।

গ্রা না দ প্রকল্প উদ্বোধন

গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ

খ। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

ARAD-CHT প্রকল্পের (২০০৭-২০১৭) আওতায় Women Resource Network (WRN) এর অংশীদারীত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২২৯ জন নারীকে নারীর প্রতি সহিংসতা, জেন্ডার ও সামাজিক শান্তির উপর প্রশিক্ষণ, জেলা পর্যায়ে নারী সম্মেলন, নারী দিবস উদযাপন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ২০টি উপজেলায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে সহিংসতা প্রতিরোধে মানববন্ধন, সমাবেশ করা এবং সহিংস ঘটনায় মামলা রুজু করা, ভিকটিমকে সহায়তা প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলায় তিন জন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও জেন্ডার ও সামাজিক শান্তির উপর ফ্লাটফর্ম তৈরি বা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, যাঁরা এখন নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও নির্যাতিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা কাজে যুক্ত রয়েছেন।

খাবার পানি ও স্যানিটেশন

ক। সাবমার্সিবল নলকুপ (সমৃদ্ধি)

অপরিকল্পিতভাবে বন ধ্বংসের কারণে তিন পার্বত্য জেলায় পানির সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এই সমস্যা সমাধানে ২০১৪ সাল থেকে CIPD রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নে ENRICH (সমৃদ্ধি) প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ১৫টি সাবমার্সিবল নলকুপ স্থাপন করেছে। বোধিপুর বড় পাড়ায় স্থাপিত টিউবওয়েল থেকে বর্তমানে ১৭টি পরিবার ও ৬টি দোকানে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। মালা চাকমা, স্বামী- লাক্ষ্যে মনি চাকমা বলেন "এই পানি ব্যবহারের ফলে অসুখ-বিসুখ কমেছে এবং কৃষি কাজে বেশি সময় দিতে পারায় আগের তুলনায় আয় বেড়েছে, সিআইপিডি অনেক পূণ্য লাভ করবে।"

ডিপ টিউব ওয়েলের মাধ্যমে পানি সরবরাহ

পানি সরবরাহ- জি.এফ.এস. মরংছড়ি

খ। কমিউনিটি ভিত্তিক জিএফএস (সমৃদ্ধি)

সাপছড়ি ইউনিয়নের মরংছড়ি গ্রামবাসীদের খাবার ও ব্যবহার্য পানির সমস্যার সমাধানের জন্য ২০১৯ সালে ফুরামোনের পানির উৎসে ১,০০০ ফুট দীর্ঘ জিএফএস স্থাপন করা হয়েছে ও বর্তমানে ২২টি পরিবার রান্না-বান্না, স্নান ও অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহার করছে। মরংছড়ি গ্রামের লক্ষী রাণী চাকমা বলেন- "এই পানি সরবরাহের ফলে আমাদের সারা বৎসরের জলকষ্ট দূর হয়েছে, আমরা এখন অনেক সুখে আছি।" ওয়ার্ড মেম্বার গান্ধিরাজ চাকমা বলেন "আগে অনেক চেষ্টা করেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি এবারে সমাধান হলো।"

গ। DPS নলকুপ স্থাপন (ALOKITA-2017-18)

বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন গ্রাম সাজাই মারমা পাড়া, চৌছড়ি, ঢেবাছড়া, রোয়া পাড়া, আমকাটা ছড়া গ্রামে সারা বছর পানির সমস্যা লেগে থাকে। বর্ষার সময় ঘোলাটে পানি ও শুষ্ক মৌসুমে ছড়ার পানি পান করতে হয় গ্রামবাসী-দের। ALOKITO প্রকল্পের (২০১৭-১৮) আওতায় আলেখ্যং রির্জাভ এলাকায় ১২টি গ্রামে ১২টি DPS নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। চৌছড়ি গ্রামের উন্নয়ন কর্মী দিব্য শংকর চাকমা বলেন- "খাবার পানির সমস্যার সমাধান না হলে আমাদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর হতে হতো। এই নলকুপটি স্থাপিত হওয়ায় আমাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।"

(ক) কমিউনিটি লেট্রিন

CIPD যে সব ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে অনেক ইউনিয়ন রয়েছে যেখানে গণসমাবেশের স্থান, মন্দির, মসজিদ, ক্লাব, স্কুল প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত কমিউনিটি টয়লেট নেই। এতে এলাকার জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়। বিভিন্ন ইউনিয়নের গণসমাবেশের স্থান, মন্দির, মসজিদ, ক্লাব, স্কুল প্রভৃতি স্থানে ১২ কমিউনিটি লেট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এসব লেট্রিন সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটিকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(খ) পারিবারিক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনঃ

CIPD যে সব এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেখানে অনেক দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট নির্মাণের সামর্থ্য নেই। লেগে থাকে কলেরা, ডায়রিয়ারসহ বিভিন্ন রোগব্যাধি। এই রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবহার। কিন্তু সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্র পরিবারগুলোর সেই সামর্থ নেই।

পারিবারিক লেট্রিন সামগ্রী বিতরণ

পারিবারিক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাপছড়ি ইউনিয়নে এযাবৎ ১১০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের জন্য রিং, স্লাব ও ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাপছড়ি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত হওয়ায় সাপছড়ি এলাকাবাসী অনেক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি চাকমা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

(ক) স্বাস্থ্য ক্যাম্প (ENRICH)- PKSF এর অর্থায়নে ২০১৪ সাল থেকে CIPD কর্তৃক রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন "সমৃদ্ধি" প্রকল্পের অন্যতম কম্পোনেন্ট হল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি। এই প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ৩২০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করে ৬,৬০০ জন ও ২৮ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করে ৩২৬০ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি মাসে পুষ্টিকণা, ক্যালসিয়াম ও কৃমি নাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে সুস্থ শিশুর মা হলেন দেব লক্ষী চাকমা

দেব লক্ষী চাকমা, বোধিপুর

দেব লক্ষী চাকমা (৩০) স্বামী- পূর্ণ জীবন চাকমা, বোধিপুর, ৪নং ওয়ার্ড, সাপছড়ি ইউনিয়ন এর বাসিন্দা। বিগত ২০২০ইং তারিখ প্রথম গর্ভবতী হলে তিনি সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য পরিদর্শক থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নেন ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক এর মাধ্যমে নিয়মিত গর্ভকালীন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে থাকেন। গর্ভধারণের প্রায় ৪ মাস সময়ে হঠাৎ দেব লক্ষী চাকমা শারীরিক সমস্যা অনুভব করলে সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য পরিদর্শক তাকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের ডাঃ উৎপল বর্ণা চাকমার কাছে নিয়ে যান। তখন ডাক্তার তাঁর উচ্চ রক্তচাপ এবং পিছনের শিরায় ব্যথার প্রয়োজনীয় ঔষধসহ গর্ভকালীন উপদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়মিত চেকআপ করতে থাকেন। দেব লক্ষী চাকমার উচ্চতা ও ওজন কম, শারীরিক সমস্যা থাকায় তার গর্ভকালীন সময়ে ঝুঁকি ছিল। ডাঃ উৎপল বর্ণা চাকমা এর পরামর্শক্রমে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলে এবং লেবার পিরিয়ড শুরু হওয়ার সাথে সাথেই দেব লক্ষী চাকমাকে রাঙ্গামাটি সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং তার তত্ত্বাবধানে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখ একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে মা ও শিশু দুই জনেই সুস্থ আছেন এবং প্রসবত্তোর সেবা স্ট্যাটিক ক্লিনিক এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) চক্ষু ক্যাম্প- বয়সের এক পর্যায়ে জীবন সায়াহ্নে পৃথিবীর রঙ ও আলো হয়ে আসে ঝাপসা। প্রয়োজন হয় যথাযথ চক্ষু চিকিৎসার। কিন্তু এই দরিদ্র অসহায় বয়োবৃদ্ধদের পৃথিবীর রঙ ও আলো কে ফিরিয়ে দেবে। যথাযথ চিকিৎসা পেলে তারাও ফিরে পেতে পারে পৃথিবীর রঙ ও আলো। দেখতে পায় প্রিয় সন্তান, নাতি-নাতনির মুখ। কিন্তু এ খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় প্রতি ৬ মাস অন্তর চক্ষুক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২২ পর্যন্ত ৮টি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করে ৭৭২ জনকে সেবা প্রদান ও লায়ন ক্লাব, চট্টগ্রাম এর সহযোগিতায় ১০২ জনের বিনা মূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন বিধবা বেলপুদি চাকমা

বেলপুদি চাকমা

বেলপুদি চাকমা (৬৩) স্বামী- মৃত কৃষ্ণ কমল চাকমা, গ্রাম- খামার পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, সাপছড়ি ইউনিয়ন এর বাসিন্দা এক মেয়ে সন্তানের জননী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চোখে ঝাপসা দেখা শুরু হয়। দূরের জিনিস ঠিকমত না দেখার সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতে পারতেন না। তিনি বিধবা ও পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন নি। বিগত ৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আয়োজিত চক্ষু ক্যাম্পে তার দুই চোখে ছানি পড়া রোগ ধরা পড়ে এবং তাঁর বাম চোখের ছানি সফলতার সাথে অপারেশন করানো হয়। পরবর্তী ক্যাম্পে ডান চোখের ছানি অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ সালে আয়োজিত ৮ম চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে বেলপুদি চাকমার ডান চোখের ছানি অপারেশন করানো হয়। বর্তমানে তিনি দুই চোখে পরিষ্কার দেখতে পান এবং দু'চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

পুষ্টি কার্যক্রম

ক। সবজি উৎপাদন (HFP-2006-2008)

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি পূরণের জন্য হেলেন কেলার-ইন্টারন্যাশনাল এর অর্থায়নে ২০০৫-২০০৮ সালে HFP প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। ১,০০০ সুফলভোগী পরিবারকে সবজি বীজ, মুরগি, খরগোস-(১০ পরিবার), পানির পাম্প/মোটর প্রদান ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৫টি মডেল ভিলেজ ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছে।

এতে ১,০০০ সুফল ভোগী পরিবারে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি এবং গৃহপালিত মুরগি ও খরগোস পালনের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারগুলোও তাদের থেকে পারিবারিক পরিচর্যায় পুষ্টি পূরণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

খ। পুষ্টি দোকান (SAFANSI-2016-2018)

গবেষণায় দেখা গেছে জাতীয় পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনায় পার্বত্য এলাকার পুষ্টি পরিস্থিতি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দারিদ্র্যতা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অসচেতনতা ও খাদ্যাভাসের কারণে পার্বত্য এলাকা পুষ্টি সূচকে অনেক পিছিয়ে।

জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশুর পুষ্টি পূরণের লক্ষ্যে South Asian Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI) প্রকল্পটি ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় জুরাছড়িতে ২টি ও বিলাইছড়িতে ২টি মোট ৪টি পুষ্টির দোকান ও ৪৪টি গ্রামের ১৪১ জন কিশোরী, ২৬৪ জন দুগ্ধদায়ী মা ও ৯৩ জন গর্ভবতীসহ মোট ১,১৮৯ মহিলাকে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে খিচুড়ি রান্না ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ডাল, চাল, তেল ও সবজির মিশ্রণে খিচুরি অনেক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য হলেও পার্বত্য এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে এই খাবারের প্রচলন নেই। তাই, ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে খিচুরী রান্না ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ENRICH (সমৃদ্ধি) প্রকল্পের বিবিধ কার্যক্রম

ক। সামাজিক উন্নয়ন

সমৃদ্ধি প্রকল্পের ওয়ার্ড কমিটির মাসিক সভা, গ্রামীণ উন্নয়ন সভা, গ্রাম্য সালিশ ইত্যাদি পরিচালনার জন্য এযাবৎ ওয়ার্ড ভিত্তিক ৯টি সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এই সব কেন্দ্রে আসবাবপত্রসহ স্যানিটারী লেট্রিন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ সুমনী আক্তার খামার পাড়া ওয়ার্ড কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা আলোচনা সহ বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে এলাকাবাসী মিলিত হওয়ার ও সমৃদ্ধি প্রকল্পের সেবা গ্রহণ সহজ হয়েছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কেন্দ্র

খ। যোগাযোগ

বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের কারণে ছোট ছোট ছড়ার জলস্রোত বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন গ্রাম পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়ে। বৃষ্টিপাত হলেই স্কুল-কলেজে, হাট-বাজারে যাওয়া যায় না, উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। বর্ষা মৌসুমে এমনকি প্রসূতি মা বা রোগী পরিবহণ করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এছাড়াও কিছু এলাকা বৎসরে ৬-৯ মাস জলমগ্ন থাকে। যাতায়তের এই অসুবিধা দূর করার জন্য ২০১৭- ২০১৮ সালে ধেপ্পোছড়ি গ্রামে ২টি সহ এযাবৎ ১০টি কাঠের সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে।

কাঠের সাঁকো, ধেপ্পোছড়ি, সাপছড়ি

গ। যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা ও তাদের ইতিবাচক নেতৃত্বে সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়নের সকল যুবক-যুবতীর তালিকা তৈরি পূর্বক "যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, করণীয় ও নেতৃত্ব বিকাশ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতি ব্যাচে ৩০জনকে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছে। যেমন- রাস্তার পতিত জায়গায় বাসক চারা, ফুল ও ফল গাছের চারা সম্মিলিতভাবে রোপন করে, স্কুল, কিয়াঙ, স্থানীয় বাজার সম্মিলিতভাবে পরিষ্কার করে, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে। এছাড়া প্রতি বৎসর ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়।

ফুটবল ফাইনাল খেলা- ২০২২, সাপছড়ি

২০২২ সালের যুবা ফুটবল খেলার পুরষ্কার বিতরণ করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী মহোদয়।

ঘ। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশে প্রতি বৎসর স্কুল পর্যায়ে শিশুদের নাচ-গান, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অভিভাবকরা অপেক্ষায় থাকেন এ প্রতিযোগিতার আয়োজন কবে হবে, তাদের সন্তানেরা স্ট্যাজে পারফরম করবে। ধীরে ধীরে জড়তা কাটবে, সাবলীল ভাবে বেড়ে উঠবে তাদের সন্তান। এই ভেবে সারা বছর চলে নাচ-গান, খেলা-ধুলা, চিত্রাঙ্কন চর্চা ও প্রস্তুতি। সাপছড়ি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রবীণ চাকমা বলেন "সিআইপিডির ধারাবাহিক কার্যক্রমে বর্তমানে সাপছড়ি ইউনিয়নে ঘরে ঘরে সাংস্কৃতিক চর্চা চলছে ও শিশুরা নাচ-গান, চিত্রাঙ্কনে অনেক এগিয়েছে।"

শিশুদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ঙ। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" ২০১৮ বাস্তবায়ন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের বয়স্কভাতা বিতরণ, প্রবীণ দিবস পালন, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান এবং প্রবীণদের কম্বল, চাদর, ছাতা, হুইল চেয়ার, লাঠি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর ২০১৮ইং ৭৫ জনকে বয়স্ক ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব এস এম শফি কামাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মি. অরুণ কান্তি চাকমা, চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ সুমনী আক্তার এবং ৩নং সাপছড়ি ইউপি এর চেয়ারম্যান মি. মৃণাল কান্তি চাকমা।

বয়স্ক ভাতা বিতরণ

চ। বিশেষ সঞ্চয়

'সমৃদ্ধি'র ছোঁয়া থেকে বাদ যাবে না কেউ' এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিবেচনা করে সাপছড়ি ইউনিয়নে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার, বিধবা, নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী আছে এমন পরিবারের জন্য ২ বছর মেয়াদী বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করা হয়েছে। উল্লেখিত পরিবার প্রধান তার নিজ নামে সরকারি যে কোন ব্যাংকে প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে (২০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ) যত টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন, দুই বছর শেষে সমৃদ্ধি প্রকল্প থেকে ঐ পরিবার সমপরিমাণ টাকার অফেরতযোগ্য সহযোগিতা পাবেন। এই টাকা দিয়ে পরিবারটি যেকোনো একটি আয়বৃদ্ধিমূলক স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করতে পারবেন। সাপছড়ি ইউনিয়নে বর্তমানে ৮ জনের বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু আছে এবং এ পর্যন্ত ৫ জন সদস্যকে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী

ছ। ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন

আশিষ চাকমার ভার্মি কম্পোস্ট এখন আয়ের উৎস

ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় এবং চাষের খরচও কম হয়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। তাই, সেচে পানি কম লাগে, বীজের অঙ্কুরোদগমন ক্ষমতা বাড়ে, রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয়, তা আমরা কমবেশি অনেকেই জানি।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর চাকুরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন সাপছড়ি গ্রামের মঞ্জু চাকমার সন্তান আশীষ চাকমা (৩৭)। তিনি ছিলেন খুবই উদ্যোগী, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। তিনি ২০১৯ সালে প্রথমে ২টি গরু পালন সহ নিজস্ব জায়গায় ফলমূল ও শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শ ক্রমে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন শুরু করেন। প্রথমে CIPD থেকে রিং ক্রয়ের জন্য নগদ ১,০০০ টাকা প্রদান ও কেঁচো সরবরাহ করা হয়। আশীষ চাকমা তাঁর উৎপাদিত সার প্রথমে তাঁর নিজের চাষকৃত জমিতে প্রয়োগ করে ভালো ফলন পাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক প্রচার হয় এবং এলাকায় ভার্মি কম্পোস্ট সারের ব্যাপক চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়ার পর আশীষ চাকমা নিজ খরচে ভার্মি কম্পোস্ট আরো ব্যাপক আকারে উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে ৪টি গরু পালনের মাধ্যমে ১০টি রিং বাড়িয়ে কম্পোস্ট সার উৎপাদন করছেন। উৎপাদিত কম্পোস্ট সার প্রতি কেজি ১৫ টাকা হারে মাসে অনুমানিক ৮০ হতে ১০০ কেজি বিক্রি করেন। এ থেকে তিনি বর্তমানে মাসিক ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা আয় করছেন। তিনি এ কাজের পদ্ধতিগত পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়ে খুব উপকৃত হয়েছেন বলে জানান এবং CIPD সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি এতে এলাকায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে, খেতে পারছেন রাসায়নিক বিষমুক্ত সবজি।

জ। বন্ধু চুলা

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে, ধোঁয়াজনিত কারণে চোখ জ্বালাপোড়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের রোগ, অক্সিজেন প্রবাহ হ্রাস, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হতে পারে। গ্রামীণ নারীরা গড়ে প্রতিদিন ৫ ঘন্টা রান্নাঘরে থাকেন। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব বন্ধু চুলা। এই চুলায় যেমন ধোঁয়া নির্গত হয় রান্নাঘরের বাইরে, তেমনি লাকড়ি লাগে কম এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থাকে কম। এ সব বিষয়গুলো আমলে নিয়ে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সাপছড়ি ইউনিয়নে ৫০টি বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে। বন্ধু চুলার উপকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে সাপছড়ি ইউনিয়নস্থ প্রায় ৪৫৯টি পরিবার বন্ধু চুলা স্থাপন ও ব্যবহার করছেন। এতে যেমনি জ্বালানি ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমেছে, তেমনি ধোঁয়ার কারণে সৃষ্ট শারীরিক সমস্যা থেকে রেহায় পাচ্ছেন এলাকার নারীরা।

ঞ। ঔষধি বাসক চাষ ও সজিনা গাছ রোপন

পরিবারের আয়বর্ধন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ও দেশীয় ঔষধ শিল্পের কাচাঁমালের যোগান নিশ্চিতকরণে সমৃদ্ধি প্রকল্প এলাকায় ঔষধি গাছের চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু করা হয়। CIPD থেকে ২০২২ সালে সাপছড়ি ইউনিয়নের ৫৭ পরিবারের কাছে ৭৮০ টি বাসক চারা এবং ১২০ পরিবারকে ৪০০টি সজিনা গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাপছড়ি ইউনিয়নে যৌথ খামার গ্রামে কয়েকজন বাণিজ্যিকভাবে বাসক এবং সজিনা চাষাবাদ করছেন। এতে পতিত জমির যেমন ব্যবহার হচ্ছে তেমনি বিকল্প আয়ের উৎসও তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, উচ্চ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন সজিনা ও বাসক এলাকায় সহজলভ্য হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য অঞ্চলের বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু উৎসবে "পাজন" রান্নায় সজিনা ফল অন্যতম অনুষঙ্গ।

বিকল্প উন্নয়ন

ক। কর্ম গবেষণা (ARAD-CHT -২০০৮-২০১৭)

ইইডি-জার্মান এর অর্থায়নে ARAD-CHT প্রকল্পটি ২০০৮ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০৩ (তিন) পার্বত্য জেলার ০৬ (ছয়)টি উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর, রাঙ্গামাটি সদর, বিলাইছড়ি, বান্দরবান সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল উপজেলায় মোট ২৭টি গ্রামে বিকল্প উন্নয়নের জন্য জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় যেন গ্রামবাসীরা নিজ গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো "পার্বত্য অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য একটা সমৃদ্ধ, আত্ম-নির্ভরশীল, স্বশাসিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তারা শান্তি ও মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারেন।" জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি মহোদয় ৭ নভেম্বর ২০১৭ ইং প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

ARAD প্রকল্প উদ্বোধন (২০১৭) করেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি

খ। ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি (ARAD-CHT - ২০১৭-২০২৩)

প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ে জুলাই ২০১৭ থেকে CIPD রাঙ্গামাটি সদরে ৫টি পাড়া ও বিলাইছড়ি উপজেলায় পাংখোয়া গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাংখোয়া নারীদের নিজস্ব পোশাক তৈরি করতে না পারার কারণে এই প্রকল্পের আওতায় বিলাইছড়ি সদর ইউনিয়নের বিলাইছড়ি পাংখোয়া পাড়ায় ১২ জন নারীকে "ঐতিহ্যবাহী পোষাক বুনন" এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তারা নিজস্ব পোষাক বুননে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ঐতিহ্যবাহী পাংখোয়া পোষাক তৈরির প্রশিক্ষক সাংগি পাংখোয়া বলেন- "এই প্রশিক্ষণের ফলে পাংখোয়া নারীদের পোশাক আর মিজোরাম থেকে সংগ্রহ করতে হবে না, আমরা এখন নিজেরাই পোশাক তৈরি করতে পারি।"

পাংখোয়া পোষাক বুনন প্রশিক্ষণ, বিলাইছড়ি

গ। জেন্ডার জাষ্টিস

(ARAD-CHT-(২০০৮-২০১৭) ইইডি-জার্মান এর অর্থায়নে ARAD-CHT প্রকল্পটি ২০০৮ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০৩ (তিন) পার্বত্য জেলার নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য WRN এর অংশিদারীত্বে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় গ্রাম, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন, নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় ১২টি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন, নারীর প্রতি সহিংসতায় ভুক্তভোগীদের আইনী ও মেডিকেল সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫৮টি জেলা ও ০৯টি আঞ্চলিক পর্যায়ে নারী ও নারী প্রতিনিধি সভার আয়োজনে সহায়তা করা হয়েছে।

সামাজিক শান্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

ক। ARAD-CHT প্রকল্পভূক্ত ২৭টি গ্রামের ১৫০ জন প্রতিনিধিকে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষত বন ধ্বংস ও বনের ক্ষতি থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো ও রেড+ বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যেন তারা স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ও তৃণমূল পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজনের ক্ষেত্রে সরকারের নানা উদ্যোগে সম্পৃক্ত হতে পারে।

খ। UNDP-Small Grant প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলা থেকে ১১ জাতিসত্ত্বার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ২৯ জন (পুরুষ ২১, নারী-৮) ছাত্র-ছাত্রীকে জীব বৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ। আইপেক (IPAC)

বন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তথা বনজীবীদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বনের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস করে তাদের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বন রক্ষার জন্য বাংলাদেশে ৫টি অঞ্চলে (সিলেট, দক্ষিণ পূর্ব চট্টগ্রাম (টেকনাফ), পার্বত্য অঞ্চল (রাঙ্গামাটি), মধ্য অঞ্চল (মধুপুর ও ভাওয়াল) এবং সুন্দরবন) আইপেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। CIPD রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান ও পাবলাখালী বনাঞ্চলে এই আইপেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ২০০৮-২০১০ সালে। মূলতঃ বন সংরক্ষণ করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও অভিযোজন করা লক্ষ্য নিয়েই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। CIPD এই দুই এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

ঘ। Local Capacities for Peace (LCP)

LCP কর্মসূচীর আওতায় DO NO HARM এমন একটি ধারণা যা কোন দ্বন্দ্ব বিরাজমান এলাকায় বিবাদমান দলের মধ্যকার উত্তেজনাকে না বাড়িয়ে বা সহিংসতাকে পরিহার করে ঐ এলাকায় পারস্পরিক সংহতি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করে। পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় করা ও উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে যাতে সহিংসতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় পর্যায়ে সমাজের নারী, যুবা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়ে উন্নয়ন, নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর অধিকার ও দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৯টি সভা ও ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম

চাকমা বর্ণমালা উচ্চারণ ও বানানরীতি কর্মশালা

(ক) চাকমা ভাষা শিক্ষা- ১১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ CIPD প্রধান কার্যালয়ে ধনঞ্জয় মেমোরিয়াল হল ও ভাষা শিক্ষা কোর্স এর শুভ উদ্বোধন এবং সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন CIPD এর সভাপতি প্রফেসর মংসানু চৌধুরী এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর ১ম ব্যাচের ২০ জন চাকমা ভাষা শিক্ষার্থীকে সম্মানিত অতিথিদের মাধ্যমে সনদ প্রদান করা হয় এবং দ্বিতীয় ব্যাচ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

আজকের পত্রিকা বৃহস্পতিবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২২

রাঙামাটিতে ভাষা বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু

এই অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে চাকমা বর্ণমালা, উচ্চারণ ও বানান রীতি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর চাকমা (চাঙমা) ভাষার উচ্চারণ, বানান রীতি ও ভাষা বিকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ভাষা শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ, ভাষা গবেষক-ভাষাবিদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে)-দের যৌথ সমন্বয়ে ভাষা গবেষণা, উচ্চারণ ও বানান রীতি নির্ধারণ বোর্ড গঠন করা, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, অপসংস্কৃতিকে রোধ এবং মূলধারার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একযোগে কাজ করা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত) আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে জেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করা ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর ২০২২ইং পর্যন্ত ৬৫ জন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অভিভাবকদের চাকমা বর্ণমালা শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভাষা চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২৩ইং সংস্থার আয়োজনে কাউখালী উপজেলায় তালুকদার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মাস ব্যাপী চাকমা ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে।

(খ) চাকমা প্রাইমার ও চাকমা ভাষায় শব্দকোষ ঃ

চাকমা বর্ণমালা শিক্ষা বিষয়ে ১৯৫৯ সালে স্বনামধন্য নোয়ারাম চাকমা সর্ব প্রথম চাকমা বর্ণমালার পাঠ্যবই "চাকমার পথম শিক্ষা" প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৭৩ সালে সুগত চাকমা (ননাধন) চাকমা ভাষার ২য় পাঠ্যবই "চিজির বই", ২০০১ সালে রাংগামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক "CHAKMA PRIMER", শান্তি চাকমার সম্পাদনায় "পহর ফুদোক" (২০১৫), টঙগ্যা কর্তৃক প্রকাশিত "চিজির বই"(২০১৬) ও ইনজেব চাকমার "সাঙু" (২০১৭) প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি চাকমা ভাষার উন্নয়ন, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ, ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকাশিত বইসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে CIPD নিজস্ব অর্থায়নে চাকমা বর্ণমালা শিখন ও প্রশিক্ষণের উপযোগী সহজবোধ্য ও সকলের গ্রহণযোগ্য একটি পাঠ্যবই "চাঙমা ভাচ্ ভেত-আলাম" এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে চাঙমা র' ভান্দাল (Word Book) প্রকাশ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এবং হল উদ্বোধন

সাপছড়ি ইউনিয়নে সকল যুবাদের অংশগ্রহণে 'মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা-২০২০' শীর্ষক এক যুবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় স্বরচিত কবিতা লেখা বিষয়ে ২২ জন, ছবি আঁকা বিষয়ে-১৭ জন, প্রবন্ধ/গল্প রচনা বিষয়ে ১৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী

এছাড়াও প্রতি বছর শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদনসহ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ১৭ মার্চ ২০২২

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু

সুপক্ষ চাকমা
পিতা- গুলচোখা চাকমা
গ্রাম- দেপ্পোয়াছড়ি মুখ,
সাপছড়ি ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি।

বাংলার মহান নেতা তুমি
শেখ মুজিবুর রহমান,
স্বাধীনতার মহান নেতা তুমি
তোমার কীর্তি বাংলায় আজো বহমান।
কোটি প্রাণের ছায়া তুমি
রবে সহস্র বছর ধরে,
অগ্নি শিখার মতো অটুট
সোনার বাংলার তরে।
তুমিই শিখিয়েছো মোদের
ছিনিয়ে আনতে মোদের অধিকার,
লড়াই-সংগ্রাম করে
টিকিয়ে রাখতে অস্থিত্ব সবার
বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তুমি
জাতিকে দিয়েছো এনে,
ভুলিনি আজো তাই
রেখেছি তোমায় স্মরণে।
তোমার সেই লালিত স্বপ্নের ধারায়
এদেশ আজ উন্নয়নে উত্তাল,
ঘাতক মুক্ত এদেশ
স্বনির্ভর ডিজিটাল ।

স্বরচিত কবিতায় ১০ম স্থান অধিকার

"মুজিববর্ষ-২০২০" উপলক্ষে PKSF এর সকল সহযোগী সংস্থার যুবাদের মধ্যে কবিতা রচনা, ছবি আঁকা ও গল্প লেখা বিষয়ে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সাপছড়ি ইউনিয়নের ৫২ জন যুবা অংশগ্রহণ করে ও যুবাদের স্বরচিত ২২টি কবিতা, ১৭টি ছবি ও ১৩টি প্রবন্ধ/গল্প থেকে ৩টি কবিতা, ৩টি ছবি ও ৩টি গল্প বাছাই করে পাঠানো হয়। এই প্রতিযোগিতায় সুপক্ষ চাকমা রচিত "স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু" কবিতাটি সারা দেশের মধ্যে ১০ম স্থান অধিকার করে।

রাজা দেবাশীষ রায় কর্তৃক "ধনঞ্জয় মেমোরিয়াল হল" উদ্বোধন

ধনঞ্জয় মেমোরিয়েল হল উদ্বোধন

১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখে CIPD প্রধান কার্যালয়ে ধনঞ্জয় মেমোরিয়াল হল ও ভাষা শিক্ষা কোর্স এর শুভ উদ্বোধন এবং সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর মংসানু চৌধুরী এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়। দেবাশীষ রায় বলেন "প্রয়াত সভাপতির নামে হলের নামকরণে CIPD শ্রদ্ধাষ্পদ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা প্রদানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।"

পরিদর্শন

CIPD এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন সময়ে দাতা সংস্থা, সহযোগী সংস্থা, সরকারি প্রতিনিধিগণ সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।

(ক) Reneta Lok Dessallien (UNDP RR), Dr. Stefen Frowin (Ambassador EC), Stefen Fringe (UNDP CD), Patric Sweeting (Project Director of CHTDF-UNDP) and Ambassadors of France, Italy, Sweden, Denmark, Germany and Hollands এর ২০০৪ সালে খারিক্ষ্যং গ্রাম পরিদর্শন করেন।

(খ) এমআরএ প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন

৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে MRA (Microcredit Regulatory Authority) প্রতিনিধি জনাব মোঃ আব্দুল হক, উপ-পরিচালক ও জনাব মোঃ রোমান খান- সহকারী পরিচালক সাপছড়ি এলাকায় সংস্থার মাঠ কার্যক্রম ও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ সংস্থার কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও তিন পার্বত্য জেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে CIPD কে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(গ) পাঃ চঃ আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য জনাব নুরুল আলম ও শ্রী সাথোয়াই প্রু মারমা, ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. CIPD সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলায় এনজিও কার্যক্রমের সুবিধা ও অসুবিধার দিক নিয়ে CIPD এর সভাপতি মংসানু চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

জনাব নুরুল আলম, সাথোয়াই প্রু মারমা
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য

মীনাক্ষী বর্মন, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এর পরিদর্শন

বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মিজ মীনাক্ষী বর্মণ ১৪ই মার্চ ২০২২ খ্রিঃ সংস্থার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁর পরিদর্শন কালে সংস্থার বাস্তবায়িত ও বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

(চ) পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পরিদর্শন

জনাব মোঃ রেজাউল, উপ-সচিব, উন্নয়ন শাখা, পার্বত্য মন্ত্রণালয় ১লা মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ জুরছড়ি উপজেলায় রাইস ব্যাংক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তিনি বহেরাছড়ি রাইস ব্যাংক থেকে ধান বিতরণ ও গ্রামবাসীদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন "এই রাইস ব্যাংক এলাকার খাদ্যাভাব দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি"। এছাড়াও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি এলাকায় সাপছড়ি মহিলা সমিতি পরিদর্শন ও মহিলাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল, উপ-সচিব, পার্বত্য মন্ত্রণালয়

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন

১২ জুলাই ২০১৮ খ্রি. সালে জনাব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক এর হাউজিং প্রকল্পের নির্মাণাধীন গৃহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি নারী সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

(জ) PKSF চেয়ারম্যান এর পরিদর্শন

PKSF এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান ২০১৭ ও ২০১৯ সালে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনকালে তিনি দেপ্লোছড়ি বিহার ও প্রাইমারী স্কুলের সংযোগকারী ১০০ ফুট দীর্ঘ কাঠের সেতু পরিদর্শন ও বিহার প্রাঙ্গণে এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন "এলাকার নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধিগণ আন্তরিক হলে এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তাই এলাকার উন্নয়নে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও ধর্মীয় গুরুদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।"

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ধেপ্লোছড়ি, সাপছড়ি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ক। ইঁদুর বন্যায় খাদ্য বিতরণ (RCRP-২০০৮-২০১০)

২০০৭-০৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরছড়ি, বিলাইছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা ও থানচি উপজেলায় ইঁদুর বন্যা শুরু হলে WFP এর সহায়তায় CIPD বরকল, জুরছড়ি, বিলাইছড়ি উপজেলায় ৭,৩৫৪ পরিবারকে খাদ্য সাহায্য প্রদান করে।

ইঁদুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের খাদ্য বিতরণ

জুমিয়া পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে ডব্লিউএফপি

খ। অগ্নিকাণ্ডে ত্রাণ বিতরণ

(১) CIPD কর্তৃক ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. দুরছড়ি বাজারের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ৩০০ পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানের উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুমিতা চাকমা বলেন- "ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেড যেন কাজ করতে পারে সেজন্য এখনই পরিকল্পিতভাবে রাস্তা ও গলি প্রসস্থ রেখে দোকান তুলতে হবে"। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব তাজুল ইসলাম বলেন, "CIPD এর দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়"। তিনি ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য CIPD কে ধন্যবাদ জানান ও সকলকে ধৈর্য্য সহকারে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করার আহ্বান করেন। উল্লেখ্য যে, গত ২০ অক্টোবর ২০১৬ ইং এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে বাজারের ২৫০টি দোকানসহ বসতবাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেলে ৩০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ত্রাণ বিতরণ- দুরছড়ি বাজার

ত্রাণ বিতরণ-সুরিদাস পাড়া

(২) নানিয়ারচর উপজেলায় ১৪ মাইল সুরিদাস পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ৯৫ পরিবারের জন্য ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনলাল চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারমান) উপস্থিত ছিলেন। জনলাল চাকমা বলেন "দুর্যোগের মোকাবেলা করা CIPD এর একটা ব্রত, তাই এই সামান্য ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি।" গৌতম দেওয়ান বলেন "এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকাণ্ডের জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে।"

গ। ভূমিধসে (২০১৭) নিহত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

অনুদান বিতরণ, শিল্পকলা একাডেমী, রাঙ্গামাটি

মৌসুমী বায়ু ও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে ১২-১৪ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ৩ দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়, যা সারাদেশে দুই মাসের বৃষ্টিপাতের চেয়েও বেশি। এই অবিরাম, প্রবল ও ভারী বর্ষণের ফলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৩-১৪ জুন ২০১৭ খ্রিঃ ভয়াবহ ভূমিধস হয়। ফলে শুধুমাত্র রাঙ্গামাটি শহরে অন্তত ৪০টি এলাকায় পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে ও কয়েকশত বসতবাড়ি, কয়েক হাজার একর বাগান-বাগিচা, ধান্য জমি, ক্ষেত-খামার সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সদর উপজেলার সমস্ত ফসলী ও ধান্য জমি, ক্ষেত-খামার, পাহাড়স্থ ফলমূল বাগান ধ্বংস ও নিচু জমি কাদা-মাটি, পাথর ও বালিতে ভরাট হয়ে যায়। সরকারি হিসাব মতে, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায়-৭৩ জন, কাপ্তাই-১৮ জন, কাউখালী-২১ জন, জুরাছড়ি-৬ জন ও বিলাইছড়ি উপজেলায়-২ জনসহ মোট ১২০ জন নিহত হয়। আহত হয় কয়েক শত নারী-পুরুষ-শিশু। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি, এমনকি একই পরিবারের ৬ জন পর্যন্ত প্রাণ হারায়। নিহত পরিবারদের মধ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা ও শুকনো খাবার বিতরণ ও শহরে ২৩টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। জেলা প্রশাসন, রেডক্রস, সেনাবাহিনী থেকে এই সব আশ্রয় কেন্দ্রে চার মাস ধরে খাবার বিতরণ করা হয়েছিল। PKSF এর সহায়তায় CIPD ২২শে নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমি হলরুমে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভূমিধসে মৃত মোট ৭৪ জনের প্রতি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও কাপ্তাই উপজেলায় ১৮ জন, কাউখালী ২১ জন, জুরছড়ি ৬ জন ও বিলাইছড়ি উপজেলায় ২ জন মোট ১২০ জনের মধ্যে ৬,৫০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

অনুদান বিতরণ, কাপ্তাই উপজেলা

ঘ। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনের উহানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দেখা দেয় যা কোভিড-১৯ নামে পরিচিত। বাংলাদেশে ৮ই মার্চ ২০২০ সর্ব প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত ও ১৬ এপ্রিল ২০ প্রথম মৃত্যুর পর ২৩ মার্চ ২০২০ থেকে প্রথম তিন মাসের লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

স্যানিটাইজার সামগ্রী বিতরণ

হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন

এই রোগ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে মানবজাতির অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এই করোনাভাইরাস রোধে CIPD এর উদ্যোগে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, স্যানিটাইজার সামগ্রী (স্প্রে মেসিন, ব্লিচিং পাউডার, বালটি, মগ), লিফলেট বিতরণ ও হাত ধোয়ার সুবিধার্থে হ্যান্ডওয়াশ পয়েন্ট স্থাপন করা হয়। হাত ধোয়া-ই সকল প্রকার ভাইরাস ও রোগ জীবাণু থেকে নিজেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম কৌশল- এই ধারণার প্রচারের মাধ্যমে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও অভ্যস্ত করতে CIPD রাঙ্গামাটিতে রাজবাড়ি ও টিটিসি এলাকায় হাত ধোয়ার ৩টি বেসিন স্থাপন করে।

দারিদ্র্য বিমোচন

ক। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি-(২০০৭-২০২৩)

WFP এর সহযোগিতায় ভিজিডি ও আরএমপি নারীদের সামাজিক সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান কালে প্রকল্পের চুক্তি অনুযায়ী ২০০৪ সাল থেকে CIPD নারী সুফলভোগীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ শুরু করে। PKSF এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ২০০৭ সালে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে- ১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, ২) মহাজনী ঋণ রোধ ও সুদের হার কমানো। বর্তমানে রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, জুরছড়ি, বাঘাইছড়ি, বাঙ্গালহালিয়া (রাজস্থলি), ঘাগড়া (কাউখালী) উপজেলায় এই ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে CIPD ৬ প্রকার ঋণ প্রদান করছে।

ঋণের প্রকারভেদ-

ক) অগ্রসর-১ ও ২ (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ)

৫টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। করোনা মহামারিতে এ কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষুদ্রব্যবসা, কৃষি উৎপাদন, গবাদি খামার, কুটির শিল্প ইত্যাদি খাতে এই ঋণ দেওয়া হয়। ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ১১০ পুরুষ ও ৫৮১ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ থেকে ২ বৎসর মেয়াদে ক্ষুদ্রব্যবসা, কৃষি উৎপাদন, গবাদি খামার, কুটির শিল্প ইত্যাদি খাতে অগ্রসর-২ ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

খ) জাগরণ ঋণ- যে কোনো খাতে এই ঋণ দেওয়া হয়। মূলত পারিবারিক আয় বৃদ্ধিই এই ঋণের মূল লক্ষ্য। ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৫৯ পুরুষ ও ৬,৬৬৩ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়।

গ) আয়বর্ধক ঋণ- সমৃদ্ধি কর্মসূচি এলাকায় যে কোনো খাতে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। ২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৬৭০ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়।

"CIPD আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে"

বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা কাচালং বাজারের একজন সৎ ও পরিশ্রমী সফল নাপ্পি ব্যবসায়ী মং বাসেন রাখাইন। তার বয়স ৪০ বছর। তার পিতা মৃতঃ উ মং রাখাইন দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে এই নাপ্পি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তার বাবা বেঁচে থাকতে ৩০,০০০ হাজার টাকার ব্যবসা ছিল। আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে কোনো রকমে তার পরিবার চলত। পিতার মৃত্যুর পর মং বাসেন ২০০৯ খ্রি: সালে CIPD থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে নূতনভাবে নাপ্পি ব্যবসা শুরু করেন। এখন তার দোকানের পুঁজি আগের চেয়ে বেশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩ লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে। এই ঋণের টাকায় তিনি বতর্মানে নিজেকে একজন মর্যাদাবান, কর্মক্ষম, আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এখন তিনি খুচরা হিসেবে স্থানীয় ভোক্তাদের এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে নাপ্পি পাইকারী বিক্রি করেন। তিনি বলেন- "CIPD আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

(গ) সুফলন ঋণ- পশু পালন ও কৃষি কাজের জন্য ৬- ৯ মাস মেয়াদে এই ঋণ দেওয়া হয়। ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ পুরুষ ও ১,৬৭৯ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়।

(ঘ) জীবনমান উন্নয়ন ঋণ- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ/সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ, বন্ধু চুলা, বায়োগ্যাস প্লান্ট, অগভীর নলকুপ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ঘর মেরামত, চিকিৎসা, টিভি/ফ্রিজ, সেলাই মেশিন ক্রয় ইত্যাদি বাবদ 'জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ' প্রদান করা হয়। ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৮৪ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়।

(ঙ) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ- (Asset Creation Loan) ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত সাপছড়ি ইউনিয়নে দরিদ্র পরিবারসমূহের ভৌত সম্পদ সৃষ্টি, জমি লিজ ও বন্ধক নেয়া, বন্ধক ছাড়িয়ে নেয়া, পরিবারের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্পদ সৃষ্টি ঋণ প্রদান হয়। ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ পুরুষ ও ১,৬৭৯ নারীর মধ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়।

শুক্রশোভা চাকমা এখন ২টি গরুর মালিক

পরিবারের মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে খামার পাড়া গ্রামে শুক্রশোভা চাকমার সংসার। সংসারে একমাত্র উর্পাজনক্ষম ব্যক্তি তাঁর স্বামী। শুক্রশোভার খুব ইচ্ছা ছিল গরু পালন করে সংসারে সহযোগিতা করার। একদিন CIPD সমৃদ্ধির কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় হয়ে ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন ও ২০১৭ সালে খামার পাড়া মহিলা সমিতিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। এরপর ২০১৯ সালে ২০,০০০ টাকা সম্পদ সৃষ্টি ঋণ নিয়ে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে ১টি গরু ক্রয় করে গরু পালন শুরু করেন। সেই গরুটি ২০২০ সালে ৪২,০০০ টাকায় বিক্রি করে আবার ৬০,০০০ টাকায় ২টি গরু ক্রয় করেন এবং বর্তমানে দুইটি গরু পালন করছেন। শুক্রশোভা চাকমা বলেন "সমৃদ্ধি কর্মসূচি থেকে সম্পদ সৃষ্টি ঋণ পেয়ে আমার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়েছে।"

(চ) গৃহ ঋণ-

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় গ্রামীণ দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও গৃহহীন পরিবার, দরিদ্র পৌর এলাকাবাসী, বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা নারী, নারী প্রধান ৫০টি পবিবারকে ২০১৮ সালে ৫% সুদে ৩ বৎসর মেয়াদে প্রতি গৃহের জন্য ৭০,০০০ টাকা গৃহঋণ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পে গৃহীত ঋণের সাথে নিজস্ব টাকা যোগ করে গৃহ নির্মাণ করার সুযোগ থাকায় অনেকে কিছুটা উন্নত মানের স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করতে সমর্থ হন। ফাতেমা বেগম স্বামী মোঃ আলাউদ্দিন তবলছাড়ি মসজিদ এলাকায় বসবাস করছেন। নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করতে না পারায় তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। ২০১৮ সালে সিআইপিডি থেকে ৭০,০০০ টাকা গৃহঋণ নিয়ে সে এখন নিজ ঘরে বাস করছেন। এখন প্রতিমাসের বাসা ভাড়ার টাকা সাশ্রয় ও সঞ্চয় করতে পারছেন। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের খামার পাড়ার কাঠমিস্ত্রি সুবল কুমার চাকমার স্ত্রী কালাসোনা চাকমার বাড়িতে চালা দিয়ে পানি ঢুকতো। কিন্তু চাল মেরামত করার সামর্থ ছিল না। সিআইপিডি থেকে ঋণ পেয়ে নতুন ঘর নির্মাণ করেন।

নতুন বাড়ির সামনে কালাসোনা চাকমা

নতুন বাড়ির সামনে ফাতেমা বেগম

খাদ্য নিরাপত্তা

ক। রাইস ব্যাংক স্থাপন (PEARL-২০১৩ -২০১৭)

তিন পার্বত্য জেলার জুমিয়া চাষীরা প্রতি বৎসর বাংলা (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ) মাসে চরমভাবে খাদ্যাভাবে ভোগেন। অন্য দিকে আশ্বিন-কার্তিক মাসেও এই খাদ্যাভাব জুমিয়াদের মধ্যে চরম আকার ধারণ করে। এই খাদ্যাভাব (ভাদরাত-উত্তরবঙ্গের মঙ্গা) মোকাবেলার জন্য এই প্রকল্পের অধীনে জুরাছড়ি উপজেলায়- ০৭টি এবং বিলাইছড়ি উপজেলায়-৪টি মোট-১১টি "গোলাঘর' বা 'রাইস ব্যাংক' স্থাপন করা হয়। এই 'রাইস ব্যাংক' থেকে জুমিয়া কমিউনিটি খাদ্যাভাবের সময় গ্রাম সুরক্ষা কমিটি এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুদমুক্ত ধান নিয়ে তাদের 'ভাদরাত' বা 'খাদ্যাভাব' মোকাবেলা করেন। জুম বা ধান্যজমির ফসল ঘরে উঠার সাথে সাথে ধার নেওয়া ধান রাইস ব্যাংক বা গোলাঘরে ফেরৎ দেন।

রাইস ব্যাংক থেকে ধান বিতরণ, জুরাছড়ি

"গোলাঘর আমাদের মত দরিদ্র কৃষক শ্রেণির জন্য খাদ্য নিরাপত্তায় খুবই সহায়ক বলে মনে করি" -বিমল চাকমা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরছড়ি উপজেলার একটি দুর্গম এলাকার পশ্চাৎপদ, সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনপদের গ্রাম কুসুমছড়ি। এই গ্রামে বংশপরম্পরায় আমাদের বসবাস। এই উপজেলার অধিকাংশ লোকজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রেই সুবিধা বঞ্চিত, অবহেলিত। তুলনা মূলকভাবে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ এই গ্রামের অভাবী মানুষ সম্পূর্ণ সরকারি উন্নয়নের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এই গ্রামটি। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষি/জুমের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। খাদ্যাভাব তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। এই অভাবের সময় দরিদ্রদের মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীর থেকে চড়া সুদে ধার নিতে হত। গোলাঘর থেকে ধান নিয়ে খাদ্যাভাব ও দুঃসময় থেকে মুক্ত হওয়া এমন একটি ব্যক্তি যার নাম বিমল চাকমা।

কয়েক বছর আগে তাঁর বাবা অভাবি সংসারে জন্ডিস ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। স্ত্রী ও তিন মেয়ে সন্তান নিয়ে বিমলের সংসার। গোলাঘর থেকে গত দুই বছরে কয়েক দফায় বিনা সুদে ধান নিয়ে খাদ্যাভাবের সময়কে মোকাবিলা করে নিশ্চিন্তে চাষাবাদ করেছেন এবং আশানুরূপ ফসল পেয়েছেন। অভাবের সময়ে কারোর কাছে তার আর ধর্না দিতে হয়নি। ঘরের ফসল উঠার সাথে সাথে তিনি ধার নেওয়া ধানগুলো গোলাঘরে যথাসময়ে পরিশোধ করেছেন। তিনি বলেন "এই গোলাঘর আমাদের মাঝে স্থাপিত হওয়ার কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। আগেকার সময়ে আমাদের মত দরিদ্র অভাবি কৃষক পরিবারকে প্রায় সময়েই এলাকার মহাজন, সুদি ও দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে ধর্না দিতে হতো। ফসল উঠলে পরিশোধ করতে হতো দ্বিগুণ-তিনগুণ ধান, পড়তে হত আবারও খাদ্যাভাবে। এ এক দুষ্টচক্র। কিন্তু বর্তমানে আমরা সিআইপিডি প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গোলাঘর হওয়াতে সেই সমস্ত সুদি-দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। আর এখন যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই আমরা গ্রাম সুরক্ষা কমিটি (জিএসকে) এর সাথে আলাপ করে গোলাঘর থেকে সুফল ভোগ করতে পারছি। বর্তমানে গোলাঘরের সুবিধা ভোগ করে সুদি চক্র থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে নিজ কাজ-কর্ম করতে পারছি। তাই গোলাঘর আমাদের মত দরিদ্র কৃষক শ্রেণির জন্য খাদ্য নিরাপত্তায় খুবই সহায়ক বলে মনে করি"।

বিমল চাকমা

খ। VGD প্রকল্প (২০০৩-২০১০)

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (WFP) অর্থায়নে ২০০৩-২০১০ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১০ উপজেলায় ১৫,০৮২ দুঃস্থ মহিলাকে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ- ক) ছয়টি মারাত্মক রোগের টিকা ও ইনজেকশন; খ) ডায়রিয়া ও খাবার স্যালাইন; গ) রাতকানা রোগ ও ভিটামিন এ; ঘ) ম্যালেরিয়া; ঙ) সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট; খাদ্য ও পুষ্টি; চ) মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; ছ) শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; জ) স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; ঞ) জন্ম নিবন্ধীকরণ; ট) সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা ঠ) মাদকদ্রব্যের কু-ফল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও ২০০২ - ২০০৫ সালে ৫টি থানায় ১৪৬০ জন আরএমপি মহিলাকে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"অল্প বয়সে বিবাহ দিবেন না, বিবাহও করবেন না"

রিংকু বেগম স্বামী মোঃ আলমগীর, ব্লক-সি, কাপ্তাই প্রকল্প এলাকা, কাপ্তাই ইউনিয়ন, ২০০৩-২০০৫ চক্রের একজন আরএমপি সুফলভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে তার বিবাহ হলে ১৬ বৎসর বয়সে তিনি ১ম সন্তানের জন্ম দেন। এরপর ১৮ বৎসর বয়সে ২য় সন্তানের জন্ম দিতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আরএমপি সুফলভোগী হওয়ার পর স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের পর তিনি বুঝতে পারেন যে অল্প বয়সে বিয়ে হলে মহিলাদের কী বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশিক্ষণের পর তিনি প্রতিবেশীদের অল্প বয়সে বিবাহ না দেওয়া ও বিবাহ না করার উপদেশ দিতে থাকেন।

গ। নগদ বিতরণ (VGD-২০০৩-২০১০) প্রথমে VGD সুফলভোগীদের শুধু সামাজিক সচেতনতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কিন্তু অর্থের অভাবে তারা আয়বর্ধক প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পারে না। তাই ২০০৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বাঘাইছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি উপজেলার ৩৬০০ জন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগীকে ৭,০০০ টাকা করে VGD Cash Grant প্রকল্পের আওতায় ২,৫২,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয় যেন তারা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পারেন। এই টাকা দিয়ে মহিলারা সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেন।

নগদ অর্থ বিতরণ, আলেক্ষ্যং, বিলাইছড়ি

ঘ। পারিবারিক উন্নয়ন প্যাকেজ (ALOKITA- ২০১৭-১৮)

বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের রেংক্ষ্যং সংরক্ষিত বন এলাকায় বসবাসকারী ২৭টি পাড়ার ৫৯০ টি পরিবারের মধ্যে আলোকিত প্রকল্পের আওতায় তাদের প্রস্তাবিত পারিবারিক উন্নয়ন প্রস্তাব অনুযায়ী ১২,৪১০ টাকা করে মোট ৭৩,২২,০০০ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়। এই নগদ বিতরণ করেন CIPD এর সাধারণ সম্পাদক যশেশ্বর চাকমা। চিংলা মারমা, সাইজাই পাড়া, আলেক্ষ্যং, ফারুয়া ইউনিয়ন বিলাইছড়ি উপজেলা বলেন- "আমরা বন বিভাগের অধীনে আলেক্ষ্যং-এ বাস করি, বাঁশ-গাছ বিক্রি করে দিনাতিপাত করি। আলোকিত প্রকল্পের মাধ্যমে ১২,৪১০ টাকা আমাদের বিরাট প্রাপ্তি, এটা আমাদের জীবনমান উন্নয়নে খুবই সহায়ক হবে।"

গবেষণা ও প্রকাশনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা CIPD এর অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যে CIPD সর্ব প্রথম "পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই প্রকল্পটি রূপায়ণ দেওয়ান এর নামে গ্রামীণ ট্রাস্ট অর্থায়ন করে ২০০১ সালে। দ্বিতীয় গবেষণা করা হয় টেবটেবা ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে কি পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার নির্দেশিকা প্রণয়ন করার জন্য। পরবর্তীতে ARAD প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা, রাবার চাষ ও UNDP-CHTDF কর্তৃক বাস্তবায়িত CE & ED প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়নে গবেষণা করা হয়েছে। এছাড়া আদিবাসী জ্ঞান (বৈদ্য চিকিৎসা) ও ভাষা-সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি বই সম্পাদনা ও প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে প্রকাশিত বই ও গবেষণা রিপোর্টসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

গবেষণা-

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থপনা নির্দেশিকা (২০০৫)- টেবটেবা ফাউণ্ডেশন, ফিলিপাইন এর অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে CIPD কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণার ভিত্তিতে এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়।

২। পলিসি রিসার্চ- প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (১) পার্বত্য চট্টগ্রামে রাবার চাষঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-২০১০, (২) Present status of Education in Chittagong Hill Tracts (২০১০)- ARAD-CHT- ২০০৭-২০১৭ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত রাবার চাষ ও Present Status of Education শীর্ষক ২টি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

৩। An assesssment of the UNDP-CHTDF project on Promotion of Development and Confidence Building in CHT relating to implementation of the CHT Accord ১৯৯৭- তিন পার্বত্য জেলায় কমিউনিটি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে UNDP-CHTDF এর অর্থায়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত UNDP-CHTDF জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন (Community Empowerment-(CE) এবং ২০১০-২০১৩ পর্যন্ত Community Empowerment and Economic Development-(CE &ED) প্রকল্প বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। UNDP-CHTDF এর দীর্ঘ সময়ের কার্যক্রমের মূল্যায়ন-মূলক এই গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

৪। Advocacy Paper- Local and civil society views on the project Promotion of Development and Confidence Building in CHT implemented by UNDP through CHTDF (২০১৪)- UNDP-CHTDF এর Community Empowerment and Economic Development-(CE & ED) প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় সিভিল ও উন্নয়ন কর্মীদের মতামতের আলোকে ৭টি সেক্টরের (জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি ও আস্থা সৃষ্টি) মধ্যে অর্জিত ফলাফলের তুলনামূলক সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। বৈদ্য তালিক চিকিৎসা (২০১৬)- এটি আদিবাসী জ্ঞান ভিত্তিক একটি চিকিৎসা শাস্ত্র। তিন পার্বত্যবাসীদের বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় আদিবাসী বৈদ্যদের প্রভাব অপরিসীম। বর্তমানেও আনুমানিক ৫০% জন আদিবাসী বিভিন্ন অসুখে বৈদ্যদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এই বৈদ্য চিকিৎসা বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও গবেষণা এযাবৎ হয়নি। এটি বৈদ্য চিকিৎসার বিষয়ে ২য় বই। প্রথম বইটি রচনা ও প্রকাশ করেন ডাঃ ভগদত্ত খীসা ১৯৯৬ সালে। মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনে অর্থায়নে PEARL প্রকল্পের আওতায় "বৈদ্য তালিক চিকিৎসা" বইটি প্রকাশ করা হয়। এই বইয়ে বৈদ্য চিকিৎসা পদ্ধতি ও বনৌষধি, বৈদ্য চিকিৎসার গুরুত্ব ও করণীয় এবং বৈদ্য চিকিৎসার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এই তিন অনুচ্ছেদে বৈদ্য চিকিৎসার একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি তুলে ধরা হয়।

প্রকাশনা-

১। Workshop Report-Discussion meeting on Micro-Credit Programme (২০০৪)- এই প্রকাশনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে ২টি গবেষণা রিপোর্ট (১) জনলাল চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত "Micro-credt Program in CHT-NGO perspective" ও (২) ড. ফজলুল আলম কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা "Micro Credit for income generating activities: The experience of CODEC" এই দুই প্রবন্ধসহ কর্মশালার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

২। ফলমূল উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (২০০৮)- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বাগান চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য ওর্য়াল্ড ব্যাংক এর অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফলমূল উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়।

৩। শান্তির স্বপক্ষে স্থানীয় সক্ষমতা বিকাশ (২০১০)- শান্তির স্বপক্ষে স্থানীয় সক্ষমতা বিকাশ বিষয়টি ARAD-CHT প্রকল্পের একটি অংশ, যা স্থানীয় নেতৃত্ব ও এনজিও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিহিত। এটি অন্যভাবে বলা হয় DO NO HARM ধারণা যা যে কোনো দ্বন্দ্ব বিরাজমান এলাকায় বিরাজমান দলের মধ্যকার উত্তেজনা না বাড়িয়ে বরং ঐ এলাকায় পারস্পরিক সংহতি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে কাজ করতে সহায়তা করে। এই DO NO HARM ধারণার বিষয়ে এই বইটি প্রকাশ করা হয়।

৪। Cultural Diversity of Indigenous Communities of Chittagong Hill Tracts (২০১২)- এটি তিন পার্বত্য জেলার তেরটি জাতিসত্তার পোষাক, অলংকার, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, বেতশিল্প, বিবাহ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জীবন-জীবিকা, বেইন বুনন, পিঠা, জুমচাষ, বন্যপ্রাণি শিকার, খেলাধুলা বিষয়ে রঙিন ক্যাটালগ এবং চাকমা লোকসংগীত গেঙহুলি গানের একটি সিডি EJCPC প্রকল্পের আওতায় MJF এর অর্থায়নে মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

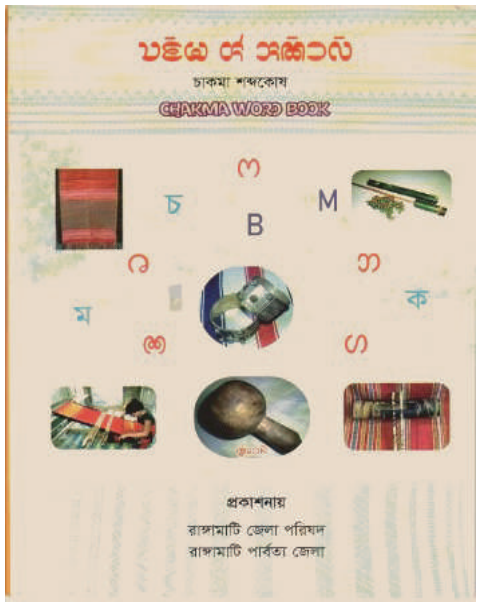

৫। "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও পার্বত্যবাসীদের অধিকার ও ঐতিহ্য" প্রকাশনাটি রাজা দেবাশীষ রায়ের ইংরেজিতে লিখিত তিনটি লেখার বাংলা অনুবাদের সংকলন। এই প্রকাশনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও আইনসহ ভূমি, জুমচাষ ও ভূমি বিরোধ- এসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। রাজা দেবাশীষ রায়ের ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রমোদ বিকাশ কার্বারী এবং মালেইয়া ফাউণ্ডেশনের সাথে যৌথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ২০১৬ সালে।

৬। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ বই আকারে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ও তারুম উন্নয়ন সংস্থাসহ যৌথভাবে প্রকাশ করা হয় ২০২০ সালে।

৭। চাঙমা ভাচ্-ভেত্ আলাম (২০২২)-২০১৬ সাল থেকে তিন পার্বত্য জেলায় প্রাক-প্রাইমারী পর্যায়ে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই ৩টি আদিবাসী ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হলেও স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাদানের কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই শিক্ষাদানে অগ্রগতি না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে আদিবাসী ভাষায় শিক্ষাদানে প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, ভাষা শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকদের গুরুত্ব না দেওয়া ও অনাগ্রহ। তাই শিক্ষক, অভিভাবক ও চাকমা ছাত্র-ছাত্রীদের শিখন ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি সহজ পাঠ্য প্রাইমার "চাঙমা ভাচ্-ভেত্ আলাম" (২০২২) বইটি প্রকাশ করা হয়।

৮। চাকমা শব্দকোষ (২০২২)- চাকমা ভাষার সংরক্ষণ ও চাকমা ভাষা শিখনের জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে চাকমা শব্দকোষ (২০২২) বইটি প্রকাশ করা হয়।

সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

সিআইপিডি রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মননা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিআইপিডি-এর রজতজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মননা প্রদান করা হয়। তাঁদের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য। সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।

পদ্মা। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন। ঢাকা। ১৯৯৭ সনের নভেম্বর মাসের একেবারেই শেষ প্রান্ত। তখন চলমান শান্তি সংলাপের একেবারেই চূড়ান্ত পর্যায়। শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান তখন সুনিশ্চিত হন, দুপক্ষ– রাষ্ট্র ও পার্বত্য অঞ্চল এর মধ্যে সংলাপ চলাকালে হওয়া প্রচণ্ড যুক্তি-পাল্টা যুক্তি ও তুমুল বিতর্কের অবসান হতে যাচ্ছে এবং স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে বহু কাঙ্ক্ষিত শান্তিচুক্তি।

এমন চরম পর্যায়ে ও তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি তখন ভাবতে শুরু করে দেন তাঁর জীবনের পরবর্তী কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে। উন্নয়ন অবরুদ্ধ ও উন্নয়ন বঞ্চিত পার্বত্যবাসীর কথা ভাবতে গিয়ে এবং তাঁর জনসম্পর্ক ও সমাজ সেবা নতুন ফর্মে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে শ্রী দেওয়ান সিদ্ধান্ত নেন সিআইপিডি গঠনের। তাঁর এ বাস্তব সম্ভাবনা– জীবনের পরবর্তী ইনিংস্রের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন সরকারি কর্মকর্তা জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ও জনাব জুলফিকার আলী অবহিত হলে তাৎক্ষণিক প্রশংসা করেন, পরদিনই এনজিও ব্যুরো হতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এনে দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত কয়েকজন সমমনা মানুষের সম্মিলনে এভাবেই গড়ে উঠে সিআইপিডি। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সিআইপিডি-কে বাঁচাতে শ্রী দেওয়ান ২০০৭ সনের দিকে সরে যান। তাঁর এ সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘ বছরের। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই মহতী অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ২০১৬ সনে দীর্ঘ ৪৭ বৎসরের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি এখন সৃজনশীল কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। সিআইপিডি তাঁকে মনে রেখেছে। রজতজয়ন্তী উদযাপনকালে সিআইপিডি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য ভূমিকাকে স্মরণ করে সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে এ সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন তাঁর সন্তান মিজ মন্টি দেওয়ান।

২. প্রয়াত ধনঞ্জয় চাকমা (১৯৩১-২০০৮)। সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

একজন সৎ ব্যক্তি ও সমাজকর্মী হিসেবে সমাজে ও তাঁর কর্মস্থলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড হতে এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর- এডমিন হিসেবে ৩০ আগষ্ট ১৯৮৯ সনে অবসরে যান। তিনি চাকমা রাজবিহার কমিটির

একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সিআইপিডি'র প্রতিষ্ঠা কাল থেকে আমৃত্যু সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পৃক্ততা সিআইপিডি-র ভাবমুর্তি যেমন উজ্জ্বল করেছে, তেমনি তাঁর উপদেশ-পরামর্শও সিআইপডি-কে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

তিনি ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সনে কাচলং নদী বিধৌত কাচলং উপত্যকার জনপদ– মারিশ্যাচরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান এখন কাপ্তাই হ্রদের জলতলে। তাঁর কর্মজীবন বনবিভাগের চাকুরি নিয়ে শুরু হলেও তিনি সরকারের কৃষি বিভাগে স্থায়ী চাকুরি লাভ করেন। তবে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে তাঁকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে বদলি করা হয় এবং এই সংস্থা হতেই তিনি অবসরে যান। তিনি ১৯৮৭ ও ৮৮ সনে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হতে চাকমা ভাষায় রূপকথা ও কথিকা পাঠ করতেন। তাঁর ৪ সন্তান। দুই সন্তানও সিআইপিডির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

প্রয়াত ধনঞ্জয় চাকমার প্রতি পরম শ্রদ্ধা স্বরূপ সিআইপিডি ভবনের কনফারেন্স হলটি "ধনঞ্জয় মেমোরিয়াল হল" নামে নামকরণ করা হয়েছে। রজতজয়ন্তী উদযাপনকালে সিআইপিডি তাঁকে মরনোত্তর সম্মাননা স্মারক প্রদান করেছে। প্রয়াতের পরিবারের পক্ষে তাঁর তৃতীয় সন্তান শ্রী যশেশ্বর চাকমা এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন।

৩. প্রয়াত বিমলেন্দু চাকমা (১৯৬৫-২০১৫)। সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য।

জন্ম ২৬ জুন ১৯৬৫ খ্রিঃ সনে। কাপ্তাই বাঁধে জলপ্লাবিত জন্মভূমি– রাঙ্গামাটি সদরের বন্দুকভাঙ্গার মায়া ত্যাগ করে তাঁর পিতা শ্রী শুভনন্দ চাকমা ও মাতৃদেবী শ্রীমতি মিলি চাকমাকে পরিবার নিয়ে স্থানান্তরিত হতে হয় সুদূর ফেণী নদীর উৎস এলাকায়– তবলছড়িতে। তাঁরা সেখানে টিকে থাকতে পারেননি। স্থানান্তরিত হন পানছড়ি সদরের কামিনী মেম্বার পাড়ায়। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। রাঙ্গামাটি বার এসোসিয়েশনের প্রবীণতম সদস্য ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী অ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা হচ্ছেন তাঁর অগ্রজ।

প্রয়াত বিমলেন্দু চাকমা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। এসএসসি পাশ করেছেন প্রথম বিভাগে একাধিক ষ্টার মার্ক পেয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতির শিকার হয়ে কলেজ স্তরেই ছাত্রত্বের অবসান ঘটে। তবে, তাঁর মানসিক দৃঢ়তার জোরেই, বিশেষ করে সিআইপিডি-কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই ২০১০ সনে ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

অত্যন্ত সৎ ও সরল প্রকৃতির এই নিবেদিত প্রাণ মানুষটি সিআইপিডি'র প্রতিষ্ঠাকালে ছিলেন অবৈতনিক ও সার্বক্ষণিক সংগঠক। সাধরণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি সিআইপিডি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। অকাল বয়সে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সনে তিনি রাঙ্গামাটি শহরের নিজ পরিবারের সান্নিধ্যে খুবই কষ্ট পেয়ে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি পেছনে রেখে গেছেন স্ত্রী– স্কুল শিক্ষিকা সেবিকা চাকমা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলে পড়ুয়া ২ কন্যা ও ১ ছেলেকে। তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান উত্তম আশা চাকমা স্নাতকোত্তর ও ছেলে তুলিন চাকমা স্নাতক সম্পন্ন করেছে এবং কনিষ্ঠ সন্তান গ্লোরিয়া চাকমা স্নাতক অধ্যয়নরত।

সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রয়াত বিমলেন্দু চাকমাকে সিআইপিডি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মরণোত্তর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী মিজ সেবিকা চাকমা।

৪. প্রফেসর মংসানু চৌধুরী। ৩ টার্মের সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা।

জন্ম ১৯৪৪ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি, বর্তমান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়িতে। মাষ্টার্স করেছেন অর্থনীতিতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে, ১৯৬৯ সনে। পিতা স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরি করলেও তিনি সরকারি কলেজে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। ১৯৭৩ সনের নভেম্বরে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতার জীবন শুরু হয় তাঁর। ৩২ বৎসরের শিক্ষকতার পরিসমাপ্তি হয় চট্টগ্রামের সরকারি সিটি কলেজ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ সনে, প্রফেসর এর পদমর্যাদা নিয়ে।

একজন অসাম্প্রদায়িক ও রাজনীতি সচেতন সাদামনের মানুষ হিসেবে তিনি সুপরিচিত। শিক্ষকতার চাকুরি শেষে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে উন্নয়ন পরামর্শকের পরিচিতি পান। এ সময় গবেষণায় মনোনিবেশ করে কয়েকটি সৃজনশীল কর্মও প্রকাশ করেছেন। মারমা জাতির উপর তাঁর এক বিশাল ও সুগভীর যৌথ গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ভয়েসমেকারের ভূমিকাও পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস্, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন। সিআইপিডি-র সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হন ১৯ এপ্রিল ২০১৩ সনে সভাপতি হিসেবে এবং পরপর ৩য় মেয়াদ সমাপ্ত করেন ২৬ এপ্রিল ২০২২। বর্তমানে তিনি সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি সিআইপিডি-তে অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সিআইপিডি-তে তাঁর সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তাঁর অংশগ্রহণে সিআইপিডি'র মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সিআইপিডি এর রজতজয়ন্তী উৎসব পালনকালে তাঁকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

৫. মিজ নিরূপা দেওয়ান। সিআইপিডি-র সম্মানিত উপদেষ্টা।

নিরূপা দেওয়ান, সবার কাছে পরিচিত নাম। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন। শিক্ষা, খেলাধূলা, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ সেবা, মানবাধিকার– প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে তাঁর রয়েছে অনন্য ভূমিকা। শিক্ষা সমাপান্তে এম. এড্ করার পর মাতৃদেবী– প্রয়াত সুপ্রভা দেওয়ানের পদাঙ্ক অনুসরণে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি। জীবনের ৩৫ বছর ২ মাস শিক্ষকতার শেষ পর্যায়ের প্রায় ৪ বছর ছিলেন রাঙ্গামাটি সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখতে গিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন, তেমনি পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা ও স্বীকৃতি। ২০১০ হতে ২০১৬– দুই মেয়াদে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের অবৈতনিক সদস্য হিসেবে নিযুক্তি পান। তাছাড়াও জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য হিসেবেও সম্পৃক্ত থাকার পাশাপশি তিনি এখনো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি, জাতীয় ও আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এইসব দায়িত্ব প্রতিপালনকালে তাঁকে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সফর করতে হয়েছে।

মিজ নিরূপা দেওয়ানের পিতা– প্রয়াত প্রভাত চন্দ্র দেওয়ানের পিতামহ– যুবরাজ দেওয়ান হচ্ছেন মাওরুম এলপি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও বুড়িঘাট মৌজার শিক্ষা দরদী হেডম্যান। ১৯০০ সনের সূচনাকালে অন্ধকার জগত কেরেটকাবা হতে স্থানান্তরিত হয়ে এই স্কুলটিতে ভর্তি হওয়া শিশু কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ১৯২০ সনে চট্টগ্রাম কলেজ হতে গ্রাজুয়েশন করেন এবং মং সার্কেল ও চাকমা সার্কেলের এ্যাসিট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদ লাভ করেন। এই চাকুরিতে থেকে তিনি শিক্ষা প্রসার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিজ নিরূপা দেওয়ানের শিক্ষা দরদী প্রপিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটি একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছে।

যুবা

মিজ নিরূপা দেওয়ান সিআইপিডি-র সঙ্গে উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছেন ২০১৬ সনে এবং এখনো এই দায়িত্বে থেকে তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশ-পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। সিআইপিডি-র সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হলে সিআইপিডি- ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর এ দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সিআইপিডি রজতজয়ন্তী উৎসব পালনকালে তাঁকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

৬. মিজ এঞ্জেলা দেওয়ান। সিআইপিডি-র ২ টার্মের অর্থ সম্পাদক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে মিজ এঞ্জেলা দেওয়ান অবসরে যান ২০০৯ সনে। চাকুরির সুবাদে তিনি থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল, ভারত প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

২৬ এপ্রিল ২০০৯ সনে তিনি সিআইপিডি-র সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ২০০৯ হতে ২০১১ ও ২০১১ হতে ২০১৩ মেয়াদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সাধারণ পরিষদে তিনি সদস্য ছিলেন। ২০১৩ হতে ২০১৬ মেয়াদের ৭ম কমিটিতে তিনি কার্যকরী পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এরপর ২০১৬-২০২২ মেয়াদের ৮ম ও ৯ম কমিটিতে তিনি অর্থ সম্পাদক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

সিআইপিডি-তে তাঁর মতো একজন সুযোগ্য সরকারি কর্মকর্তার যোগদান সিআইপিডি-কে সম্মানিত করেছে এবং তাঁর নিরলস স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকায় সিআইপিডি উপকৃতও হয়েছে। তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সিআইপিডি এর রজতজয়ন্তী উৎসব পালনকালে তাঁকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

৭. জনলাল চাকমা। সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও ৩ টার্মের সাধারণ সম্পাদক।

জন্ম ১৯৫৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি। বর্তমান রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা হতে ১৯৬০ সনে কাপ্তাই বাঁধের কারণে তাঁর পরিবার বর্তমান বাঘাইছড়ি উপজেলায় স্থানান্তরিত হয়। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮২ সনে অর্থনীতিতে বিএসসি সম্মান এবং ১৯৮৪ সনে এমএসসি করেন তিনি। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কাজে লাগান তাঁর ঘরের পাশের কাচলং ডিগ্রী কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে। তখন তিনি বাঘাইছড়ি এলাকার গণমানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থেকে কাচলং এলাকার একজন অতি জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তিনি একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। সমাজের মধ্যকার বৈষম্য ও সুবিধাহীনতাকে তিনি অতি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে দেননি। তার মূল কারণ ছিল– এতে অনৈতিকতার চোরাবালিতে তাঁকে ডুবতে হতে পারে– এ আশংকায়। তাই, বেসরকারি উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন । তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিত্তোর সময়ে বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দুয়ার উন্মুক্ত হলে সিআইপিডি-র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। স্মরণ করা দরকার, সিআইপিডি প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে তিনি ছিলেন একজন অবৈতনিক ও সার্বক্ষণিক সংগঠক। তিনি সিআইপিডি'র প্রতিনিধি হয়ে নেপাল, ভারত, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন।

সিআইপিডি-তে প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যকরী পরিষদ সদস্য, ৫ টার্মের সাধারণ সম্পাদক ও ২০১৩ হতে বর্তমানে সিআইপিডি-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালে– অর্থাৎ বিগত ২৫ বৎসরে তিনি নিজেকে গবেষক, ক্ষুদ্রঋণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন পরামর্শক ও উন্নয়ন সংগঠক হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

সিআইপিডি গঠনে ও তার অগ্রগতিতে দীর্ঘ ২৫ বৎসরের নিরলস পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিতে শ্রী জনলাল চাকমাকে সিআইপিডি রজতজয়ন্তী উৎসব পালনকালে তাঁকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

৮.প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক : মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী মহোদয়কেও সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মননা প্রদান করা হয়। এই বিশেষ সম্মাননা মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে প্রদান করেন সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান ও সিআইপিডি'র উপদেষ্টা প্রফেসর মংসানু চৌধুরী মহোদয়।

সিআইপিডি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার ফটোগ্যালারি

উপদেষ্টা পরিষদ (২০২২-২০২৫)

মংসানু চৌধূরী

নিরূপা দেওয়ান

নির্বাহী পরিষদ (২০২২-২০২৫)

অর্ণব চাকমা
সভাপতি

সুখেশ্বর চাকমা
সাঃ সম্পাদক

মন্টি দেওয়ান
অর্থ সম্পাদক

সরসী দেওয়ান, সদস্য

আবর্তন চাকমা, সদস্য

তেজোদীপ্ত চাকমা, সদস্য

ত্রিরতন চাকমা, সদস্য

পরলোকগত সদস্যবৃন্দ

ধনঞ্জয় চাকমা

বিমলেন্দু চাকমা

আশুতোষ তালুকদার

গৌতম মুনি চাকমা

স্মৃতি ভূষণ চাকমা

প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ

রূপায়ণ দেওয়ান	গুণেন্দু বিকাশ চাকমা	জ্ঞান তালুকদার	বিভাকর তঞ্চঙ্গ্যা	সত্যবীর দেওয়ান
লক্ষী প্রসাদ চাকমা	যুথিকা চাকমা	কামিনী চাকমা	উমে মগ	মঙ্গল কুমার চাকমা

নির্বাহী পরিষদ (১৯৯৯-২০২৫)

মেয়াদ	সভাপতি, সাধারণ ও অর্থ সম্পাদক	কার্য নির্বাহী সদস্যবৃন্দ
১০ম ২৮/০৪/২০২২-২৭/০৪/২০২৫	সভাপতি- ঃ অর্ণব চাকমা সাঃ সম্পাদক ঃ সুখেশ্বর চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ মন্টি দেওয়ান	সরসি দেওয়ান আবর্তন চাকমা তেজদীপ্ত চাকমা ত্রিরতন চাকমা
৯ম ২৮/০৪/২০১৯-২৬/০৪/২০২২	সভাপতি- ঃ মংসানু চৌধুরী সাঃ সম্পাদক ঃ যশেশ্বর চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ এঞ্জেলা দেওয়ান	সরসি দেওয়ান আবর্তন চাকমা মন্টি দেওয়ান ত্রিরতন চাকমা
৮ম ১২/০৫/২০১৬-১১/০৫/২০১৯	সভাপতি- ঃ মংসানু চৌধুরী সাঃ সম্পাদক ঃ যশেশ্বর চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ এঞ্জেলা দেওয়ান	অর্ণব চাকমা তেজদীপ্ত চাকমা পূর্ণিমা চাকমা ত্রিরতন চাকমা
৭ম ১৯/০৪/২০১৩-১১/০৫/২০১৬	সভাপতি- ঃ মংসানু চৌধুরী সাঃ সম্পাদক ঃ সরসি দেওয়ান অর্থ সম্পাদক ঃ তেজদীপ্ত চাকমা	আবর্তন চাকমা পূর্ণিমা চাকমা এঞ্জেলা দেওয়ান পরিমল কান্তি চাকমা
৬ষ্ঠ ০৫/০৪/২০১১-১৮/০৪/২০১৩	সভাপতি- ঃ শীলা দেওয়ান সাঃ সম্পাদক ঃ জনলাল চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ নাইউ প্রু	জয়শ্রী দেওয়ান অর্ণব চাকমা আবর্তন চাকমা সরসী দেওয়ান
৫ম ০৪/০৫/২০০৯-০৩/০৫/২০১১ ৪র্থ	সভাপতি- ঃ শীলা দেওয়ান সাঃ সম্পাদক ঃ জনলাল চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ নাইউ প্রু	জয়শ্রী দেওয়ান অর্ণব চাকমা আবর্তন চাকমা সরসী দেওয়ান
০১/০৫/২০০৭-৩০/০৪/২০০৯	সভাপতি- ঃ ধনঞ্জয় চাকমা সাঃ সম্পাদক ঃ জনলাল চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ নাইউ প্রু	জয়শ্রী দেওয়ান অর্ণব চাকমা শীলা দেওয়ান সরসী দেওয়ান
৩য় ০২/০৫/২০০৫-৩০/০৪/২০০৭	সভাপতি- ঃ ধনঞ্জয় চাকমা সাঃ সম্পাদক ঃ জনলাল চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ বিমলেন্দু	জয়শ্রী দেওয়ান অর্ণব চাকমা শীলা দেওয়ান সরসী দেওয়ান
২য় ০২/০৫/২০০৩-৩০/০৪/২০০৫	সভাপতি- ঃ ধনঞ্জয় চাকমা সাঃ সম্পাদক ঃ জনলাল চাকমা অর্থ সম্পাদক ঃ নাইউ প্রু	মিহির ত্রিপুরা নাই উ প্রু শীলা দেওয়ান সরসী দেওয়ান
১ম ২০/০৫/১৯৯৯-০১/০৫/২০০৩	সভাপতি- ঃ ধনঞ্জয় চাকমা সাঃ সম্পাদক ঃ রূপায়ণ দেওয়ান অর্থ সম্পাদক ঃ মিসেস উমে মগ	লক্ষী প্রসাদ চাকমা জনলাল চাকমা যশেশ্বর চাকমা বিমলেন্দু চাকমা

Organogram of CIPD

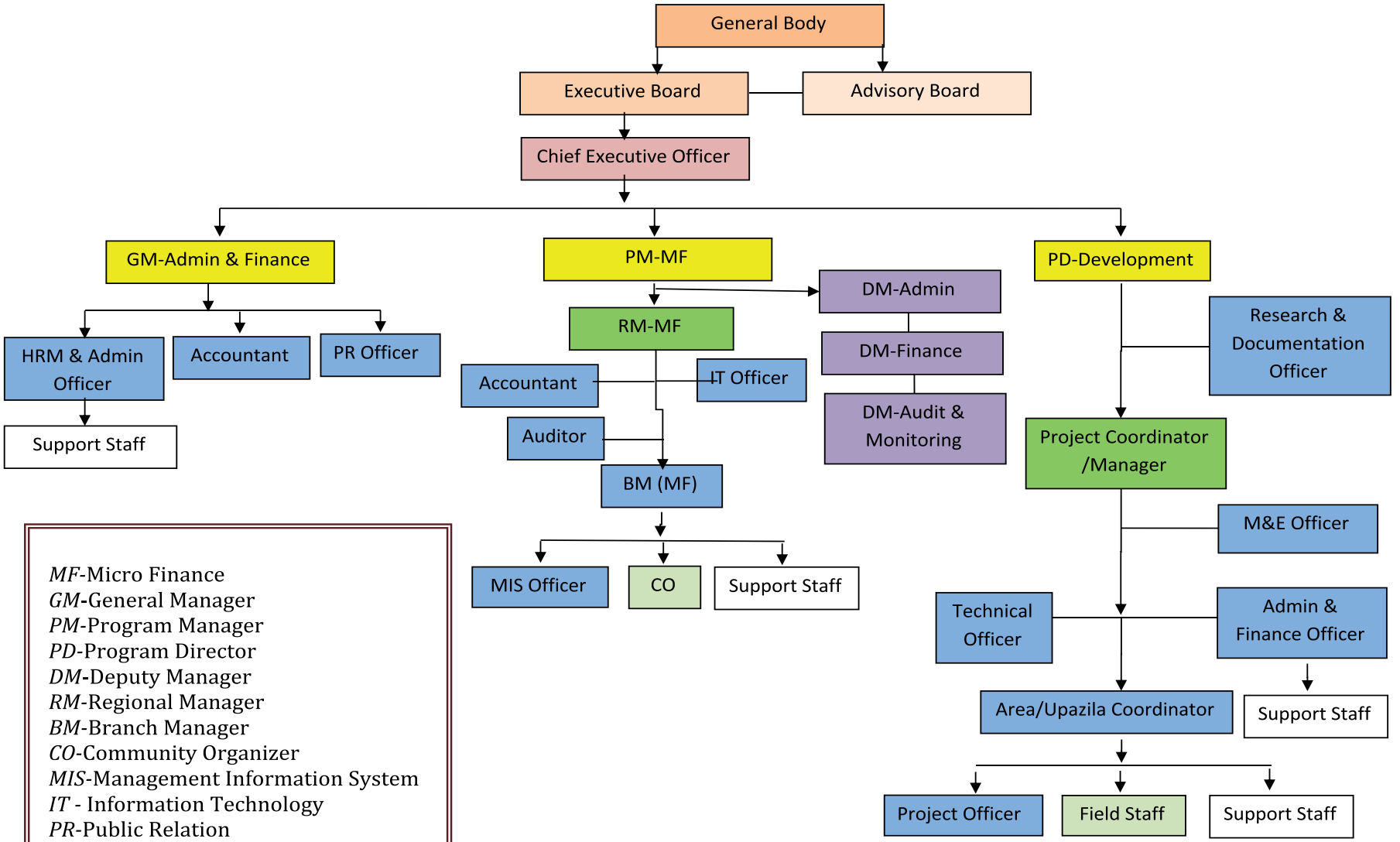

MF-Micro Finance
GM-General Manager
PM-Program Manager
PD-Program Director
DM-Deputy Manager
RM-Regional Manager
BM-Branch Manager
CO-Community Organizer
MIS-Management Information System
IT - Information Technology
PR-Public Relation
HRM-Human Resource Management
Support Staff-Office Helper, Cook, Guard, Driver etc.

চলমান প্রকল্প/কর্মসূচিঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের/কর্মসূচির নাম	সুফলভোগী	দাতা/সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রকল্প মেয়াদ	কার্যক্রম এলাকা	প্রকল্পের মূল কার্যাবলি সমূহ
১	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৫০০০	পি কে এস এফ	২০০৪- চলমান	রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, কাউখালী, কাপ্তাই	১. গ্রাম সমিতি গঠন ২. ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ৩. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ
২	সমৃদ্ধি	১৪০০ পরিবার	পি কে এস এফ	২০১৭- চলমান	সাপছড়ি ইউনিয়ন	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সেনিটেশন, পানীয় জল
৩	Action Research on Alternative Development and Capacity Enhancement of Local NGO's in CHT (ARAD-CHT).	৪৭১ পরিবার	ব্রেড ফর দ্যা ওর্য়াল্ড	২০১৯-২০২৩	রাঙ্গামাটি সদর, বিলাইছড়ি	১. উন্নয়ন/সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ ২. গ্রাম পর্যায়ে পিএআর ও পিএসপি ৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৪. স্থানীয় এনজিও ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করা ৫. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসী ৬. গবেষণা করা
৪	ভাষা শিক্ষা কোর্স	৫০০	নিজস্ব	২০২০- চলমান	প্রধান কার্যালয়	চাক্‌মা, মারমা, ককবরক, ইংরেজী (স্পোকেন)
৫	প্রবীণ জীবন মান উন্নয়ন	১০০০	পি কে এস এফ	২০১৭ -চলমান	সাপছড়ি ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, পানীয় জল

বাস্তবায়িত প্রকল্প (১৯৯৯-২০২২)

ক্রমিক	প্রকল্পের/কর্মসূচির নাম	সুফলভোগী	দাতা সংস্থার নাম	বাজেট	কার্যক্রম এলাকা	অর্জন
১।	পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি মূল্যায়ন (১৯৯৯-২০০০)	-	গ্রামীন ট্রাস্ট	৮,৭৭,৮০০	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলা	পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক গবেষণা করা হয়। এতে ৬ উপজেলার ১৭৭৭ পরিবারের ৬০১৬ জনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়।
২।	Land for Training Centre (2007)	-	OBL ATE	৫ হাজার ডলার (৩,৪১,০২৫ টাকা)	রাঙ্গামাটি সদর	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ঝগড়াবিল মৌজায় ৮০ শতক জায়গা ক্রয় করা হয়।
৩।	VGD ২০০৩-২০১০	১৫০৮ মহিলা	WFP	৪৪,৮৯,৮৮৫	১০ উপজেলা রাঙ্গামাটি	২০০৩-২০১০ সালে ১৫,০৮২ দুঃস্থ মহিলাকে VGD প্রকল্পের সুফলভোগীদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা এবং আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের বিষয়সমুহ হলো- ক) ছয়টি মারাত্বক রোগের টিকা ও ইনজেকশন; খ) ডায়রিয়া ও খাবার স্যালাইন; গ) রাতকানা রোগ ও ভিটামিন এ; ঘ) ম্যালেরিয়া; ঙ) সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট; খাদ্য ও পুষ্টি; চ) মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; ছ) শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; জ) স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; ঞ) জন্ম নিবন্ধীকরণ; ট) সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা ঠ) মাদক দ্রব্যের কুফল
৪।	CASH GRANT-VGD	৩৬০০ মহিলা	WFP	২,২৮,৪৭,৫৪৮	রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি জুরছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি,	
৫।	পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (২০০৪)	১১০০পরিবার	টেবটেবা	৪,০০,০০০	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি	পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থপনা নির্দেশিকা (২০০৫)- টেবটেবা ফাউন্ডেশন, ফিলিপাইন এর অর্থায়নে পার্বত্য চট্রগ্রামে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক গবেষণার করা হয়।
৬।	CHOLEN ২০০১-২০০৫	২১২৫ ছাত্র-ছাত্রী	কেয়ার-বাংলাদেশ	২৯,২৩,১৯৪	বাঘাইছড়ি	২০০১ -২০০২৫ ৫টি ও সেকেণ্ডারী টার্গেট হিসাবে ১০টি স্কুলের ২,১২৫ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুল গৃহ পুনঃনির্মাণ/সংস্কার, প্রতি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা ও খেলাধূলা সামগ্রী প্রদান এবং স্কুল পরিচালনা কমিটি, মা গ্রুপ নিয়ে কাজ করা হয়।
৭।	RMP (২০০৩-২০০৫)	১৪৬০ মহিলা	WFP	২,৮৯,০৬,৮৬	রাঙ্গামাটি সদর, জুরছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলী	২০০২-২০০৫ সালে ৫টি থানায় ১,৪৬০ জন আরএমপি মহিলাকে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আই জি এ প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
৮।	EAPP ২০০৬-২০০৭	৪০০ বাগান চাষী	World Bank	১৫,১৮,০০০	রাঙ্গামাটি সদর, জুরছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি,	৪০০ বাগান চাষীকে আধুনিক পদ্ধতিতে ফল মূল উৎপাদন, গ্রেডিং, সেমি-প্রসেসিং ও বাজারজাত-করণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ও ২০ টি Grower's Association গঠন করা হয়।
৯।	CMWSP ২০০৪-২০০৭	১৫০০ পরিবার	এনজিও ফোরাম	৭৫,০০০	জুরছড়ি	৬টি VDC গঠন করা হয়, ৪টি রিং ওয়েল, ১০ টি পরিবারিক রেইন ওয়াটার হার্ভেসটিং ট্যাংঙ্ক, ২টি কমিউনিটি রেইন ওয়াটার হার্ভেসটিং ট্যাংঙ্ক ও ২টি Village Sanitation Center স্থাপন করা হয়।
১০।	গ্রামীণ নারী দক্ষতা বৃদ্ধি	১০৮ নারী	BFF	১০,১৪,৪১৫	রাঙ্গামাটি সদর, খাগড়াছড়ি সদর ও বান্দরবান সদর	১০৮ জন নারীকে ট্রেনিং অব ট্রেনারস্, অফিস পরিচালনা, জেন্ডার ও নারী ক্ষমতায়ন, শিশু ও নারী অধিকার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি, এনজিও ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কার্যক্রম, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
১১।	HFP ২০০৬-২০০৮	১০০০ পরিবার	HKI	২৪,২০,৬৭৫	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা	১০০০ সুফল ভোগীকে পরিবারকে সবজি বীজ, মুরগি, খরগোস-(১০ পরিবার), পাম্প/মোটর প্রদান ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি মডেল ভিলেজ ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রকল্পের/কর্মসূচির নাম	সুফলভোগী	দাতা সংস্থার নাম	বাজেট	কার্যক্রম এলাকা	অর্জন
১২।	BRC-CHT ২০০৯	৮৭০১ শিশু	UNICEF	৯,৩৮,৫৯৫	রাঙ্গামাটি জেলা	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ২০০৮ ইং পর্যন্ত বাদপড়া ৮,৭০১ শিশুদের জন্য নিবন্ধন করে দেয়া হয়।
১৩।	RCRP ২০০৮-২০১০	৭০০০ পরিবার	WFP	১,১৫,৫৯,০৯৯	জুরছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি,	২০০৮ সালে ইদুঁর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৭,৩৫৪ পরিবারকে ৩ মাস পর্যন্ত খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ সালে ১,০০০ পরিবরাকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক সংরক্ষণের জন্য মাসিক খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হয়।
১৪।	IPAC ২০০৮-২০১০	৪০০০ পরিবার	IRG-USA	৪৮,৬৮,৮৪০	জাতীয় উদ্যান, কাপ্তাই	সংরক্ষিত বনে বসবাসকারী কমিউনিটির অংশদারীত্বে বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
১৫।	CE&ED ২০০৪-২০১৩	২৩০০০ জন	CHTDF-UNDP	৭,৩৫,২২,২০৫	রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই	২৮৩টি পাড়া উন্নয়ন কমিটি, ৯০টি পাড়া নারী উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, কৃষি, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ ইত্যাদি বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, ৪০টি ঝঋঝ স্থাপন ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি মেলা আয়োজন করা হয়।
১৬।	EJCPC ২০০৭-২০১৪	২৯০০ পরিবার	MJF	৩,২০,০৬,৯৩৮	জুরছড়ি, বিলাইছড়ি,	১২টি গ্রাম সুরক্ষা কমিটি (জেএসকে) গঠন ও ৭২ জনকে নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, ২৩টি রাইস ব্যাংক স্থাপন ও ১৪,৮৮৪ আড়ি ধান মজুদকরণ, ৯০০ জনকে কৃষি, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, ২টি সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হয়।
১৭।	VE-CHT ২০১৩-২০১৪	২০০০	UNDP	২২,১৪,৮৮২	রাঙ্গামাটি সদর, বরকল, জুরছড়ি, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি	৫০টি ইউনিয়নে ভোটাধিকার ও ভোট প্রদান বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই প্রকল্পটি বান্দরবান জেলায় হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন ও খাগড়াছড়ি জেলায় জাবারং কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়।
১৮।	ALOKITA ২০১৭-১৮	৫৯০ পরিবার	UNDP	১,১২,৮০,০০০	ফারুয়া ইউনিয়ন-বিলাইছড়ি	৫০০ নারী-পুরুষকে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রতি পরিবারকে ১২,০০০ টাকা নগদ আর্থিক অনুদান প্রদান, ১৩টি নলকুপ স্থাপন ও ৮টি সেচ মেসিন প্রদান করা হয়।
১৯।	SAFANSI	১১৮৮ নারী	MJF		জুরছড়ি ও বিলাইছড়ি	প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা ও শিশুর পুষ্টি পূরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ সালে এই প্রকল্পের আওতায় ১,৭৯৪ জন মাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জুরছড়িতে ২টি ও বিলাইছড়িতে ২টি মোট ৪টি পুষ্টির দোকান স্থাপন করা হয়।
২০।	PEARL ২০১৩ -২০১৭	৩৬০০ পরিবার	MJF	১,৭২,০১,৩৯০	জুরছড়ি ও বিলাইছড়ি	১৮টি গ্রাম সুরক্ষা কমিটি (জেএসকে) সদস্যদের (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দক্ষতা, জেন্ডার এবং 'আয় বর্ধক, ১৪টি রাইস ব্যাংক স্থাপন, ১১০০ জনকে ৭৭৬ পুরুষ, ৩২৪ নারী) ফলমূল চাষ প্রশিক্ষণ, ৭০০ জনকে (২৮৯ পুরুষ, ৪১১ নারী) কৃষি ও সবজি চাষ, ৩০০ জন (১০৮ পুরুষ ১৯২ নারী) গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ বিষয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৩১৬ টি শুকর ও ৮৫টি ছাগল বিতরণ এবং ১,১০০ পরিবারকে ৫০,০০০ রাংগুই আম, ৮,০০০ অম্রপালী, ২,০০০ আপেল কুল ও ২,০০০টি চাইনা থ্রি লিচু চার বিতরণ করা হয়।
২১।	ARAD-CHT (২০০৭-১৪)	১৪৫৬ পরিবার	EED-German	৩,৮৮,৪২,১১৮	খাগড়াছড়ি সদর রাঙ্গামাটি সদর বিলাইছড়ি বান্দরবান সদর রোয়াংছড়ি নাইক্ষ্যংছড়ি	গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য কর্ম গবেষণা, গ্রাম সহায়ক ও নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও তথ্য সহায়তা, সামাজিক শান্তি ও জেন্ডার ন্যায্যতা পলিসি বিষয়ে বিভিন্ন কর্মশালা, জীব বচিত্র ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
	(2014-2019)		BftW	৫,৩৯,৯৯,৭৫০		

রেজিস্ট্রেশনঃ

ক্রমিক	কর্তৃপক্ষ/বিভাগ	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	তারিখ
১	সমাজ সেবা বিভাগ	রেজিঃনং- রাঙ্গা-১১৫/১১	২০/১২ ২০১১ খ্রিঃ
২	এনজিও ব্যুরো	১৯৫৬	৯/৯/২০০৪ খ্রিঃ (২০২৯ পর্যন্ত নবায়িত)
৩	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০০৩৮১২-০০৬২০-০০৬২৪	১৭/০৪/২০১২ খ্রিঃ

কার্যালয়ঃ

ক্রমিক	ঠিকানা	কনট্যাক্ট পারসন	মোবাইল
১	প্রধান কার্যালয়- টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি	জনলাল চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৮৩১৮২৪৩৬৭
		ভেটায়্যান চাকমা, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	০১৮২০৩২০৭৯২
২	রাঙ্গামাটি সদর শাখা- টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি	পূণ্যধন চাকমা, শাখা ব্যবস্থাপক	০১৮৫৯১১২০১১
৩	বাঘাইছড়ি শাখা- বাবু পাড়া, বাঘাইছড়ি	মিজ রুনা চাকমা, শাখা ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮৬৬৬৯৭৭১৮
৪	জুরছড়ি শাখা- জুরছড়ি সদর, জুরছড়ি	মিজ যমুনা চাকমা, ভার-প্রাপ্ত শাখা ব্যবস্থাপক	০১৮৩৮৯৮৬৫২৬
৫	সাপছড়ি শাখা-সাপছড়ি	মিজ চামেলি চাকমা, প্রকল্প পরিচালক, সমৃদ্ধি	০১৫৫৭৩৭৮১১৬
৬	বাঙ্গাল হালিয়া শাখা- বাঙ্গাল হালিয়া বাজার, রাজস্থলী	সাধন চন্দ্র চাকমা, শাখা ব্যবস্থাপক	০১৮৪৩১৪২৬১৫
৭	কাপ্তাই শাখা-বড়ইছড়ি, কাপ্তাই	অমর বিকাশ চাকমা, শাখা ব্যবস্থাপক	০১৮৩৯০৯০৬৯৮

সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CIPD) এর সিটিজেন্স চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)

ভিশন (রুপকল্প): পার্বত্য এলাকা একটি পার্বত্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রথাগত স্ব-শাসিত অঞ্চল, যা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী। যেখানে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সহভাগিতার মূল্যবোধ ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ বিরাজমান ও জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং নারী-পুরুষ সমতা ও মর্যাদার সহিত বসবাস করছে।	**মিশন (অভিলক্ষ্য):** পার্বত্য এলাকার স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে কারিগরি, অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নারী পুরুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করা। প্রথাগত জ্ঞানের বিকাশ, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং নারী পুরুষের সমঅধিকারের চেতনাকে বিস্তৃত করে জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।	উদ্দেশ্যঃ প্রথাগত শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা; নারী পুরুষের সম মর্যাদা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা; শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা রক্ষা ও বিকাশ করা; গবেষণা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা; শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।

	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবী, ফোন ও ইমেইল)
নাগরিক সেবা	তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য প্রদান	অধিযাচিত তথ্য প্রদান (পত্র/সফটকপি/ই-মেইল)	তথ্য প্রাপ্তির জন্য/ ই-মেইল/ডাকযোগে /সরাসরি আবেদন	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কার্যদিবস	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ০১৮২০৩২০৭৯২ এবং শাখা ম্যানেজার
	গবেষণা, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য তথ্য	আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ	আবেদন পত্র ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল/ সরাসরি	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০১৮৩১৮২৪৩৬৭
	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	প্রকল্পের গঠন ও শর্ত অনুযায়ী	প্রকল্পের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে	প্রকল্পের মেয়াদ ও ধরণ অনুযায়ী।	
	প্রশিক্ষণ	নিজস্ব ভেন্যু/ বহি:ভেন্যুতে /মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ	লক্ষ্যস্থিত জনগোষ্ঠী।	বিনামূল্যে/প্রযোজ্য ফি গ্রহণ	প্রকল্পের মেয়াদ ও ধরণ অনুযায়ী।	সংস্থার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী

প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহ	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সদস্য হিসাবে ভর্তি	এমআরএ -এর আইন-বিধি এবং সংস্থার নীতিমালা অনুসারে ভর্তি এবং সক্ষমতানুসারে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : ১. নিধারিত আবেদনপত্র : ২.ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ৩. স্থায়ী বাসিন্দা সনদ। প্রাপ্তিস্থান: ব্র্যাঞ্চ অফিস	বিনামূল্যে	অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবস	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ০১৮২০৩২০৭৯২ ও সংশ্লিষ্ট শাখার ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
	ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেবাসমূহ (সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য) সাধারণ সঞ্চয় স্বেচ্ছা সঞ্চয় দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় (৫ ও ১০ বছর মেয়াদী)	পাক্ষিক/ মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে সাধারণ সঞ্চয় ও স্বেচ্ছা সঞ্চয় জমা ও মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় হিসাব পরিচালনা করা	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: পাশবই, ঠিকানা, সদ্য তোলা ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি এবং নমিনীদের নাম, ঠিকানা ও NID/জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি প্রাপ্তিস্থান: ব্র্যাঞ্চ অফিস, সমিতিতে সংশ্লিষ্ট লোন অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে।	বিনামূল্যে	সাধারণ ও স্বেচ্ছা সঞ্চয় ক্ষেত্রে ভর্তি কালে এবং দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কর্মদিবস	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ০১৮২০৩২০৭৯২ ও সংশ্লিষ্ট লোন অফিসারের মাধ্যমে ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
	ক্ষুদ্রঋণ সেবাসমূহ ঃ ১. জাগরণ ঋণ (৭০,০০০ পর্যন্ত) ২. অগ্রসর ঋণ (১০ লক্ষ পর্যন্ত) ৩. আয়বর্ধক ঋণ (৬০,০০০ পর্যন্ত) ৪. সম্পদ সৃষ্টি ঋণ (৩০,০০০ পর্যন্ত) ৫. জীবনমান উন্নয়ন ঋণ (১০ হাজার পর্যন্ত) ৬. সুফলন ঋণ (৫০,০০০ পর্যন্ত) ৭. সাহস ঋণ (১০,০০০ পর্যন্ত) ।	আবেদনের প্রেক্ষিতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) -এর সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি এবং সংস্থার নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাচাইপূর্বক সিআইপিডি সদস্যদের সক্ষমতানুসারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : ১. আবেদন পত্র, সদস্য সদ্য তোলা ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ২. ঋণ প্রোডাক্ট অনুসারে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবস	সংশ্লিষ্ট লোন অফিসারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
	সিআইপিডি ক্ষুদ্রঋণ ঝুঁকি সেবাসমূহ - একক /যৌথ ক্ষুদ্রঋণ ঝুঁকি সেবা	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহনকালে নির্ধারিত হারে চাঁদা/প্রিমিয়ার প্রদান।	ঋণ আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র	বিনামূল্যে	ঋণ বিতরণের পূর্বে/চাঁদা/প্রিমিয়ার প্রদানপূর্বক	সংশ্লিষ্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
	শিক্ষা বৃত্তি (ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সদস্যার ছেলে-মেয়ে মাসিক যথাক্রমে ৭০০, ১০০০টাকা ২বছর ও ৬বছর ।	জিপিএ -৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছেলে-মেয়েদের এসএসসি ও এইচএসসি লেভেলে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	* সুনির্দিষ্ট ফরমে আবেদন, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের সীট, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির কাগজ পত্র * সেমিষ্টার পরীক্ষার ফলাফলের	বিনামূল্যে	১ (এক) বছর অন্তর	শাখার ম্যানেজার ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোবাইল ঃ ০১৫৫৬৭০২৬৭৩
	ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম মঞ্জুর	অগ্রিম প্রদানের মঞ্জুরী পত্র	নির্ধারিত ফরমে আবেদন ভবিষ্য তহবিলের সর্বশেষ বিবরণী	বিনামূল্যে	১ (এক) মাসের মধ্যে ।	সিইও এবং সভাপতি , ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা কমিটির

অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহ	নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর	অর্জিত ছুটি মঞ্জুরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন।	বিনামূল্যে	১ (এক) মাসের মধ্যে ।	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সিইও ।
	মাতৃত্বকালীন ছুটি	মঞ্জুরীপত্র	তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন।	বিনামূল্যে	১ (এক) মাসের মধ্যে ।	
	চিকিৎসা ছুটি	মঞ্জুরীপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ তত্ত্বাবধাক কর্মকর্তার সুপারিশ	বিনামূল্যে	১ (এক) মাসের মধ্যে ।	
	প্রশিক্ষণ (দেশে/বিদেশে)	ব্যবস্থাপনার অনুমোদন মোতাবেক মনোনয়ন	নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন	বিনামূল্যে	১ (এক) মাসের মধ্যে ।	

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ক্রমিক নং	সেবা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা মোবাইল নম্বর ও ইমেইল	নিস্পত্তির সময় সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	ঋণ অফিসার, ফিল্ড অফিসার ও হিসাবরক্ষক	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার	অনধিক ৩০ কার্য দিবস
২	সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা হলে	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোবা ঃ ০১৫৫৬৭০২৬৭৩	অনধিক ৩০ কার্য দিবস
৩	কেন্দ্রিয় কর্মকর্তা হলে	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত এর নিকট (সিইও) আবেদন করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোব ঃ ০১৮৩১৮২৪৩৬৭	অনধিক ৬০ কার্য দিবস

অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে আপিল কর্মকর্তাগণের নিকট পর্যায় ক্রমে আপিল করা যাবে।

অভিযোগ নিস্পত্তির পদ্ধতি

ক্রমিক নং	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	আপিল কর্মকর্তা	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির সময় সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা হলে	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/প্রকল্প কর্মকর্তা	প্রধান কার্যালয় মোবাইল ঃ ০১৫৫৬৭০২৬৭৩ veteayon.chakma@gmail.com	অনধিক ৬০ কার্য দিবস
২.	অভিযোগ নিস্পত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/প্রকল্প কর্মকর্তা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ ক্ষোভ প্রশমন কমিটি	প্রধান কার্যালয় মোবাইল ঃ ০১৮৩১৮২৪৩৬৭ ইমেইল ঃ cipdcht@gmail.com cipdcht@yahoo.com	অনধিক ৬০ কার্য দিবস

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

প্রধান কার্যালয়

টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি-৪৫০০, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

ইমেইল ঃ cipdcht@gmail.com,.ফোন ঃ ০২৩৩৩৩৭২০৭৬

প্রবন্ধ

স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকা

মংসানু চৌধূরী

১. বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সিআইপিডি (সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট) একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সিআইপিডি মনে করে, পার্বত্যবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একই সাথে এটাও অনস্বীকার্য যে, এই অঞ্চলের অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন এবং তা অব্যাহত রাখার মতো গুরুভার বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। উন্নয়নের কৌশল অনুসারে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও জনগণের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের পরিপূরক শক্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

২. বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর এদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার মতো একটি কঠিন কাজে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সরকারের উন্নয়ন সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যেমন দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থিক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামেও ১৯৯৭ সনের পার্বত্য চুক্তির পর এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত ও অবহেলিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সিআইপিডিও সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

৩. এই জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় উদাহরণ হিসেবে সিআইপিডি কর্তৃক ২০০৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে গৃহিত ও বাস্তবায়িত Peoples' Empowerment for Accessing Rights to Livelihood (PEARL) প্রকল্পটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। যেমন প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, (ক) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় লক্ষিত জুমিয়া জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (খ) মানবাধিকার, নারী অধিকার, নাগরিক অধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, (গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং (ঘ) ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জুমিয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রথাগত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বৃদ্ধি করা।

৪. স্মর্তব্য যে, একটি দেশে বা অঞ্চলে মানবাধিকার ও সুশাসন তখনই নিশ্চিত করা যায়, যখন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি জনগণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রাপ্তি ও ভোগের ক্ষেত্রে তাদের অধিগম্যতা নিশ্চিত করা যায়। যে সমস্ত অধিকারের বিষয় এখানে উল্লেখিত হয়েছে সবগুলোকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এইসব অধিকারের লভ্যতাকেও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংবিধান স্বীকৃত এইসব অধিকারে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিগম্যতা রয়েছে। সুতরাং, আইনি ও নৈতিকভাবে (আদালত কর্তৃক বারিত না হলে) এইসব অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। সরকারও নাগরিকের জন্য এইসব অধিকারসমূহের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরকে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করেছে।

৫. মূলত সিআইপিডি উন্নয়ন সহযোগী একটি সংস্থা হিসেবে PEARL প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এতদঞ্চলে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ এই অধিকারসমূহ কারা, কীভাবে পূরণ করবে সেই বিষয়ে ধারণা প্রদান করার কাজ করেছে। এ ধরনের আরো কয়েকটি প্রকল্প সিআইপিডি বাস্তবায়ন করেছে। যেমন- গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'গ্রামীণ নারী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প'-২০০৫-২০০৮, জনগণকে ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতন করার জন্য 'Vote Education -CHT' ২০১৩-২০১৪, বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম গবেষণা ও উন্নয়ন ও সমাজকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ARAD (২০০৮-২০২৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্ম এলাকায় জুম চাষিদের গ্রামে, যেখানে প্রান্তিক জুম চাষিদেরকে মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়, এক একটি রাইস ব্যাংক বা ধানের গোলাঘর স্থাপন করে দিয়েছে যাতে খাদ্যাভাব মোকাবিলায় চাষিরা ধান ঋণ হিসেবে নিতে পারে। পরে জুমের ফসলের নাগাল পেলে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিআইপিডিকে Service Delivery Agency-র ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম গবেষণা ও পার্বত্য অঞ্চলের সমাজ কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৬ সাল থেকে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। এখন প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায় চলছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ২৭টি গ্রামে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি মূলত গবেণষাধর্মী। হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষা গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর প্রধান উন্নয়ন কৌশল। শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ে গৃহিত পরিকল্পনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পেরেছে। মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভিজিলেন্স ও সক্রিয় সুশীল সমাজ গঠন, নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সচ্ছলতা বাড়ানো, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ যুবাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ, বনভূমি ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আত্মকরণ, ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যের উন্নয়ন ইত্যাদি অর্জনে প্রকল্পটি কর্মএলাকার তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিকতাবোধ উন্নয়নে আরও একাধিক প্রকল্প সিআইপিডি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করেছে। বাহুল্যের বিবেচনায় সে সব প্রকল্পের আলোচনা করা হলো না।

৮. এছাড়াও, সিআইপিডি নিজস্ব ও পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে একটি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্র ঋণের সহায়তায় গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিসহ তাদের সামাজিক মর্যাদাকে সমুন্নত করা। যুগ যুগ ধরে শোষণ, বঞ্চনা আর চরম দারিদ্র্যের কারণে এই অঞ্চলের মানুষ তাদের মানবিক মর্যাদা ও ক্ষমতা হারিয়েছে। এই সব মানুষ সমাজের ক্ষমতার কাঠামোকে দেখেছে, কিন্তু এই ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে তারা বরাবরই অজ্ঞ থেকেছে। তা নিয়ে তারা কখনও চিন্তা করে দেখার চেষ্টা করেনি। ফলে বছরের পর বছর তারা দারিদ্র্যের এই বিষময় চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সিআইপিডি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মোট ৬টি উপজেলায় এই ঋণ কার্যক্রম নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলোকে চরিত্রের দিক থেকে Welfare State হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ, একটি আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষ যাতে স্বাভাবিক মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, অন্তত তার ন্যুনতম চাহিদা পূরণে সরকার দায়বদ্ধ। সেই লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে যাতে সেই দপ্তরগুলো থেকে উদ্দিষ্ট সেবাসমূহ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও আমজনতার কাছে ঐসব সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব দপ্তরের কাজ হলো, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো জনগনের কাছে সহজলভ্য করে তোলা যাতে এই মৌল প্রয়োজনগুলো, যেগুলো পাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে, সেগুলো পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত না থাকে। এই সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সরকারি দপ্তরের সহযোগী হিসেবে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র্যপীড়িত ও জনবহুল দেশের উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে, তার কার্যকর মোবিলাইজেশন সহজতর নয়। মাঠ পর্যায়ে সরকারের যে সব সেবা দপ্তর রয়েছে তাদেরও কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যে কারণে, সরকার প্রদত্ত পরিষেবা লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারে না। ঠিক এই জায়গাতেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সরকারি সেবা দপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। এই সমন্বয়ের কাজ যত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা যাবে, ততই জনগণ উপকৃত হবে।

পরিচিতি: অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, বিশিষ্ট গবেষক ও সমাজকর্মী, উপদেষ্টা - সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি।

E-mail: cmongsanu@yahoo.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রমঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অম্লান চাকমা

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রেক্ষিত বিবেচনায় তিন পার্বত্য জেলায় এনজিও কার্যক্রমের ইতিহাস ততটা দীর্ঘ সময়ের নয়। সমতলে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর এনজিওদের পথচলা শুরু হয়। কিন্তু সেই যাত্রা পার্বত্যাঞ্চলে শুরু হয় আরো প্রায় দুই দশক পরে। মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সাথে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরই তিন পার্বত্য জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। তার আগে ব্র্যাক, প্রশিকার মত কতিপয় জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হলেও তা তিন পার্বত্য জেলার উপজেলা সদর এবং নিকটবর্তী ইউনিয়ন যেখানে সড়ক পথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা আছে সেখানে পরিচালিত হত। তবে এই ধরনের জাতীয় পর্যায়ের এনজিওসমূহের ঋণ সংক্রান্ত বা অন্যান্য প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের তেমন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

সাধারণ জনগণের মাঝে এনজিওদের কার্যক্রম সম্পর্কে নানা ধরনের ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণাও ছিল। বিশেষত পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকরীজীবী এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী কিংবা যে কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ঋণ গ্রহণ তাদের কাছে রীতিমত আতংকের বিষয় ছিল। এর কারণ হিসাবে আমরা অত্রাঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান, চুক্তির পূর্ববর্তী সময়ের দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাসকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখতে পারি। তাছাড়া দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচারণার কমতি, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব এবং অফিস-আদালতের সাথে সাধারণ জনগণের এক ধরনের যোগাযোগহীনতাকেও কারণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি।

জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমনঃ উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও সেসময় বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের প্রদত্ত সেবাসমূহ সেভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে পারতেন না। আর শুরু থেকে যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের (তৎকালীন স্থানীয় সরকার পরিষদ) বিরুদ্ধে অধিকাংশ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের বিরোধীতা ছিল, তাই প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাধারণ জনগণের সঙ্গে যে ধরনের যোগাযোগ, জনসম্পৃক্ততা তাদের থাকার কথা সেভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। প্রথমবার স্থানীয় সরকার পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ আলোচিত-সমালোচিত একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত যেসব পরিষদসমূহ গঠিত হয়েছে তারা ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের মাধ্যমেই মনোনীত হয়ে এসেছেন। তবে চুক্তিত্তোর সময়ে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কর্ম পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হয়। বিশেষ করে উন্নয়ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সঙ্গত কারণে সেই পরিষদগুলো জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে সে উন্নয়নের ছোঁয়া জনগণ কতটা পেয়েছে তা নিয়ে হয়তো আলোচনা বা সমালোচনার অবকাশ থেকে যায়। তবে এই নিবন্ধে আমি সেই প্রসঙ্গে বেশি দূর যেতে চাই না।

ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোনো ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সার্কেল চীফ, হেডম্যান এবং কারবারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিতান্তই প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রাম এবং মৌজা পর্যায়ে তারা এলাকার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রথাগত বিচারিক দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছেন। গ্রাম এবং মৌজা পর্যায়ে সামজিক শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যাবে না। কোনো ধরনের তথ্য উপাত্ত ছাড়াই বলা যায়, বিগত দুই দশকে এই প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে।

১৯৯৭ সালের পূর্ববর্তী সময়ে স্থানীয়দের উদ্যোগে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গঠনের তৎপরতা দেখা গেলেও এই প্রচেষ্টা উদ্যোগ শুরুতে আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু চুক্তি পরবর্তী সময়ে অসংখ্য এনজিও গড়ে উঠে, যার ফলে তখন ব্যাঙের ছাতার মত এনজিও খুলে বসার অভিযোগ ওঠে। জনগণের উন্নয়ন, প্রতিশ্রুত কর্মকাণ্ডের প্রতি একাত্ম না থেকে এটিকে শ্রেফ ব্যবসা হিসাবে বেছে নেয়ারও কথাবার্তাও কোনো যেত তখন। রাঙ্গামাটিতে ভালেদি, কপো সেবা সংঘ, গ্রীনহিল, আশ্রয় অঙ্গন, টংগ্যা'র মত কিছু স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা চুক্তি সম্পাদনের আগে গঠিত হলেও দুই- একটি ছোট, মাঝারি মানের প্রকল্প নিয়েই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সিআইপিডি, সিসিডিআর, পাড়া উন্নয়ন সংস্থা, রাঙ্গামাটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস, হিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, সাস, সাংগ্রাই, ইনডিজিনাস মাল্টিপ্লেক্স ডেভেলপমেন্ট

অর্গানাইজেশন (ইমডো), শাইনিং হিল, হিল ভিউ ফাউন্ডেশান, হিল ফ্লাউয়ার, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, হিলেহিলি, পুগবেল, জুম সোসাইটি ফর ইন্ডিজিনিয়াস উইমেন প্রগ্রেস, গ্লোবাল ভিলেজ, বনশ্রী নারী উন্নয়ন সংস্থাসহ আরো কতিপয় সংস্থা গড়ে উঠে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চুক্তির পূর্বের সময়ে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে 'তৈমু' ও ম্রো-চেট নামক সংস্থা গড়ে উঠে। চুক্তি পরবর্তী সময়ে গঠিত অন্যান্য স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে বর্তমানে বান্দরবানে গ্রাউস, আগাপে, অনন্য কল্যাণ সংস্থা, বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি, একতা মহিলা সমিতি, ইকো ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যানেটেরিয়ান ফাউণ্ডেশন, তজিংডং, এর নাম চোখে পড়ে। নানা উত্থান- পতনের ভিতর দিয়ে তারা এখনো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।

তেমনি ভাবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১৯৯৭ সালের আগে পার্বত্য বৌদ্ধ মিশন, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, পাজুরিকো নামে তিনটি উন্নয়ন সংস্থার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি। তবে এই সংখ্যাটি সঠিক নাও হতে পারে। পরবর্তী সময়ে উক্ত জেলায় আলো, তৃনমূল উন্নয়ন সংস্থা, সারভাইবাল, পাজুরিকো, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, কাবিদাং, বড়গাং ফাউন্ডেশন, হিউম্যানিটি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, আই ডি আই, আর এল টি, জুম ফুলসহ আরো কিছু স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা কিছু কিছু প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের তুলে ধরতে এগিয়ে আসে। তবে উপরেল্লিখিত বেশ কিছু স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের বর্তমানে আপাতত দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম নেই। একথা বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার অনভিজ্ঞতা, সুদক্ষ জনবলের ঘাটতি, সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা না থাকা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় না থাকাতে এনজিওগুলোর কোন কোনটি মাঝপথে থেমে গেছে।

চুক্তিত্তোর সময়ে শুরুতে দেশী-বিদেশী নানান দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে নানান কর্মসূচি, মিশন নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল সেই ধারবাহিকতা পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক বাস্তবতার কারণে পরবর্তী এক দশকে এসে আর অব্যাহত থাকেনি। তখন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, জি টি ঝেড, এফ এ ও, ইউনিসেফ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, কেয়ার বাংলাদেশ, ডানিডা, ইউএনডি পি, ইউএনএফপিএ, একশন এইড, ডিএফআইডি, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইসি মোড, অক্সফাম জি বি, ইউএসআইডি, আইএলও, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, প্র্যাকটিকাল এ্যাকশন, কনসার্ন ইউনিভার্সেল (ভূত পূর্ব) সহ আরো কিছু আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য নানান খাতে সহযোগিতা প্রদান করে।

জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকার পাশাপশি এফ পি এ বি, আই ডি এফ, কোডেক, পদক্ষেপ, ব্লাস্ট, আশা, কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোসাল একশন (ইপসা), এইড কুমিল্লা, দুর্জয় নারী সংঘ, সূর্যের হাসি, আরএইচ স্টেপ, আনন্দ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ প্রভৃতি সংস্থাসমূহ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সামিল হয়। তবে একথা স্বীকার করাই বাঞ্চনীয় যে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যে ধরনের সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রশাসনিক সক্ষমতা, আর্থিক স্বচ্ছতা স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের থাকা দরকার ছিল তা অধিকাংশ এখনো অর্জন করতে পারেনি। যার ফলে, জাতীয় পর্যায়ের কিছু কিছু এনজিওর ন্যায় স্থানীয় এনজিওদের মধ্যেও পরিবার তন্ত্র, স্বেচ্ছাচারিতা এবং জবাবদিহীতা না থাকার কথা শোনা যায়।

২০০০ সালের দিকে যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করে তখন সদ্য গঠিত স্থানীয় অধিকাংশ এনজিওসমূহ নিজ নিজ অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। পার্বত্য জেলায় তাদের সফরের সময় এসব দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তখন এনজিওর প্রধানরা নিজেদের মত যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকে। এতে করে এনজিওদের মধ্যে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই চিন্তাধারা থেকেই তখন হিল ট্রাক্টস এনজিও ফোরাম (এইচটিএনএফ) গঠন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আহবায়ক কমিটিও গঠন করা হয়। তখন যে কোনো দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার প্রতিনিধি দল তিন পার্বত্য জেলায় সফরে এলে এই আহবায়ক কমিটি সমন্বয় করত। কিন্তু এইচটিএনএফ এর সদস্যদের মধ্যে এক পর্যায়ে কিছু কিছু বিষয়ে মত ভিন্নতা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। কমিটি পুনঃগঠনের দাবি উঠে। ২০০৪- ২০০৫ সালের দিকে সে সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল এইচটিএনএফ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি পদে রাজা দেবাশীষ রায় এর সঙ্গে প্রয়াত এডভোকেট শক্তিমান চাকমার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজা দেবাশীষ রায় অনায়াসে জয় লাভ করেন। তিন পার্বত্য জেলাতেই অত:পর একই ভাবে জেলা পর্যায়েও কমিটি গঠন করা হয়। কিন্ত নানান কারণে এইচটিএনএফ এর কার্যক্রম আর সামনে এগোতে পারেনি।

২০০০ সালের দিকে তৎকালীন NGO Forum for Drinking Water Supply and Sanitation তিন পার্বত্য জেলায় যুগপৎ ব্যাপক পরিসরে WATSAN সেক্টরে কাজ শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে Community-Managed Water & Sanitation Programme for Rural Poor of the Chittagong Hill Tracts (CM-WSP-CHT) প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে Hygiene, Sanitation and Water Supply (HYSAWA) প্রকল্প তারা স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাদের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির ফলে তিন পার্বত্য জেলার কতিপয় স্থানীয় এনজিও NGO Forum এর সার্বিক সহায়তায় এনজিও ব্যুরোর কাছ থেকে নিবন্ধন পেতে সক্ষম হয়। যারমধ্যে, আলো, আর ডি এ, তারুম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর নাম উল্লেখযোগ্য। এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন পাওয়া যে কোনো উন্নয়ন সংস্থার জন্য দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সমতুল্য। বিশেষত, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক বাস্তবতায় এ প্রক্রিয়া একটি জটিল এবং সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

NGO Forum for Drinking Water Supply and Sanitation এর বর্তমান পরিবর্তিত নাম এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ। এই জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থাটির পূর্বাপর আরো কতিপয় আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থার স্থানীয় এনজিওদের সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এদের মধ্যে কেয়ার বাংলাদেশ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, কারিতাস বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, ওয়াল্ড ভিশন, ডানিডা, ইউসিসেফ, ইউএনডিপি, একশন এইড, ব্র্যাক অন্যতম। এই সংস্থাসমূহ নিজেরা সরাসরি জড়িত না থেকে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাদের সহযোগিতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। সেই সাথে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অনেক দক্ষ কর্মী বাহিনীও গড়ে উঠেছে। এরা এক এক জন কেবল উন্নয়ন কর্মী হিসাবে নয় নিজ নিজ গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে একজন সমাজ সেবক, নিবেদিত প্রাণ যুব নেতা এবং এলাকার ইতিবাচক পরিবর্তনের একজন এজেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যার ফলে, তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থান করেও জীবন ঘনিষ্ঠ দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তারা সেখানে থেকেও নিজের পরিবার. সমাজ এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছেন। কোনো পরিকল্পনাবিদ, কনসালটেন্ট বা সরকারি- বেসরকারি কোনো সংস্থার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তাদের আর এখন বসে থাকতে হচ্ছে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনজিওদের মাধ্যমে উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের একটি সুফল হিসাবে আমরা এটিকে ধরে নিতে পারি।

আমি প্রসঙ্গান্তরে একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে খুব কাছ থেকে দেখা সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্প (সিইপি) বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পটি প্রাথমিক মেয়াদে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এসআইডি-সিএইচটি নামে প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়। ইউএনডিপি'র কার্যক্রম এখনো চলমান আছে। প্রকল্পে প্রথম ১০ বছর মেয়াদে তিন পার্বত্য জেলার অধিকাংশ উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা সিইপি প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে সম্ভবত এটিই সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী এবং ব্যয়বহুল প্রকল্প। তিন পার্বত্য জেলার প্রায় ১৫টির অধিক স্থানীয় এনজিও পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পে সহযোগী সংগঠন হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি) গঠন করা হয়। স্থানীয় এনজিওতে অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়। প্রত্যেক পিডিসি'কে নিজেদের নামে তফশীলি ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে হয়। প্রথম বারের মত গ্রামবাসীরা এনজিও কর্মীদের সহযোগিতায় নিজ নিজ গ্রামের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সামিল হয়। সেই সাথে যৌথ উদ্যোগে এবং সমবায় ভিত্তিতে তারা কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক গ্রামের জন্য ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কয়েক ধাপে প্রকল্পের ধরন এবং কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে পিডিসি'র সদস্যরা নিজেরা এই টাকা উত্তোলন করতে পারতেন। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ গ্রহণ এবং সহযোগিতা লাভের জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। পার্বতাঞ্চলের প্রেক্ষাপট, সংকট এবং সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পটি সাজানো হয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু সমবায় ভিত্তিতে বিশেষত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে না পারা, পিডিসি'র সদস্যদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, কিছু কিছু সদস্যের দুর্নীতিপরায়নতা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অনুপস্থিতির কারণে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যাশা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জিত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, সিইপি প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম, প্রকল্পের অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের কর্মী বাহিনী ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার কারণে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং সাধারণ জনগণের মাঝে যে ব্যাপক সচেতনতনার সৃষ্টি হয়েছে আজও তা দৃশ্যমান। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ইতোপূর্বে সাধারণ জনগণ বিভিন্ন অফিস-আদালত, ব্যাংকে যেতে এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগত। জনগণের মাঝে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কার কাছে ধর্ণা দিতে হবে সে বিষয়ে ধারণা কম ছিল। তাঁদের মধ্যে পরিবারের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণের চর্চা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ বিপর্যয়, জীব-বৈচিত্র্য, শিশু অধিকার, উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে তাঁরা কার্যকর ধারণা লাভ করেছেন।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলো সম্পর্কে এখনো অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে কিছু অন্যায্য ধারণা এখনো রয়ে গেছে। এনজিওদের সম্পর্কে কোনো কোনো মহলের এক ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে এখনো অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। অনেকের ধারণা রাঙামাটির 'গ্রীনহিল' এর কর্ণধার বর্তমান রাঙ্গামাটি আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য দীপংকার তালুকদার। অথচ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে উনার কমবেশি অবদান থাকলেও বিগত এক যুগের বেশি সময় ধরে উনার উক্ত এনজিওর সাথে কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা নেই। একইভাবে 'সিআইডিপি' এর সঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ এর সম্মানিত সদস্য রূপায়ন দেওয়ান এর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তবে একথা সত্য যে, এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উঠে আসার পিছনে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সঙ্গে এই সংস্থার কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ নেই। সংস্থার কোনো ধরনের পদবীও তাঁর নেই। আরেক প্রভাবশালী উন্নয়ন সংস্থা 'টংগ্যা'র ক্ষেত্রে চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় এর নাম বার বার উচ্চারিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই জানেন না যে, উক্ত সংস্থায় বর্তমানেও ১১ (এগার) জন্য সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ রয়েছে যাঁরা সকল সাধারণ সদস্যদের সম্মতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বর্তমানেও তিনি সংস্থার সভাপতি হিসাবে পালন করলেও সংস্থার গঠনতন্ত্র মোতাবেক একক ভাবে এবং অগ্রণতান্ত্রিক পন্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর বা অন্য কোনো ক্ষমতাবান সদস্যের নেই। জেলার অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব উক্ত সংস্থার কার্য নির্বাহী এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে এখনো দায়িত্ব পালন করছেন।

সেন্টার ফর ইন্টগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি) এর প্রসঙ্গ টেনে আমার এই অগোছালো নিবন্ধের সমাপ্তি টানছি। জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বেশ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আমার মেশার সুযোগ হয়েছিল। আমার ছোট কাকা প্রয়াত বিমলেন্দু বিকাশ চাকমা (সানি) শুরু থেকে এই সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আঞ্চলিক পরিষদ এর সম্মানিত সদস্য রূপায়ন দেওয়ান এর রাঙ্গামাটি শহরের ট্রাইবাল অফিসার্স কলোনীর সেই সময়কার ভাড়া বাসায় কাজের সূত্রে আমাকে মাঝে মাঝে সেখানে যেতে হত। বলাবাহুল্য সেটাই ছিল তখন সিআপিডি এর অস্থায়ী কার্যালয়। তখন দেখেছি শ্রদ্ধেয় রূপায়ন দেওয়ান, জনলাল চাকমা, অর্ণব চাকমা (বেলুন), যশেশ্বর চাকমা (বিল্টু) আর আমার কাকাসহ আরো কেউ কেউ সেখানে নানান বিষয়ে উন্নয়ন বিষয়সহ নানা ধরনের অভিমত ব্যক্ত করছেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করছেন। তাদের সেসব কথোপকথন শুনে আমার নিজের মধ্যেও এনজিও সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এভাবেই দেখতে দেখতে বছর খানেকের মধ্যে আমি নিজেও পুরোদুস্তর একজন উন্নয়নকর্মী হয়ে পড়ি। সংগঠন হিসাবে সিআইপিডি'র ২৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে এটি নিঃসন্দেহে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিশাল প্রাপ্তি। এটি একটি মাইল ফলকও বটে। যে কোনো সংস্থার জন্য তাঁরা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারেন। কারণ ১০ মে, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংস্থাটি প্রায় ২০টির মত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় তিন পার্বত্য জেলায় সিআইপিডি হচ্ছে একমাত্র এনজিও যারা নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার জন্য একটি অফিস ভবন নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতের সিআপিডি'র এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আরো গতিশীল এবং অর্থবহ হবে একজন সাধারণ উন্নয়নকর্মী এবং এই সংস্থার একজন শুভাকাঙ্ক্ষি হিসাবে এটাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

পরিচিতিঃ সংস্কৃতি ও উন্নয়নকর্মী, রাঙ্গামাটি। Email:amlancht@gmail.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সিআইপিডি একটি অগ্রগামী সংস্থার নাম

অশোক কুমার চাকমা

সিআইপিডি'র প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালে। চলতি বছরে সিআইপিডি ২৫ বছর উদযাপন করতে যাচ্ছে। তাঁদের এই উদ্‌যাপনে আমিও উন্নয়নকর্মী হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত। এই উপলক্ষ্যে সিআইপিডির প্রতিষ্ঠাতামণ্ডলী, কার্যকরী কমিটি সদস্যবৃন্দ ও সংস্থার সব স্তরের কর্মী বাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পাহাড়ের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনার আগে প্রথমে সিআইপিডি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। এই ২৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সেক্টরে সিআইপিডি নিজের যোগ্যতায় নিজেকে অন্যতম নেতৃস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সিআইপিডি'র পূর্ণরূপ 'সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট'। আমরা যারা উন্নয়ন সেক্টরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম এবং এখনো আছি, তাদের কাছে সিআইপিডি শুরুতে বাংলায় 'আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্র' হিসেবে পরিচিত ছিলো। ইংরেজিতে বলা হতো 'সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)। পরে আদিবাসী শব্দ নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হওয়ায় সিআইপিডি অক্ষুন্ন রেখে এর পরিবর্তন করা হয় 'সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট'। এই ২৫ বছরে সিআইপিডি পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের জন মানুষের উন্নয়নে অনেক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং করে যাচ্ছে।

সবাই জানে, পার্বত্য চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে অশান্ত ছিলো। এই অঞ্চলের মানুষের স্বশাসনের দাবীতে দীর্ঘ আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিলো। দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ চলেছিলো। এই সমস্যার সমাধান হয়েছিলো ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। পরিস্থিতি অশান্ত থাকার কারণে ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়নি। মূলতঃ ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পরেই পাহাড়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ তৈরি হয়। সিআইপিডিও পার্বত্য চুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন নিয়ে। সিআইপিডি তাঁর সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন ব্যক্ত করেছে এভাবেঃ CIPD believes in non-directive, bottom up, integrated and participatory development framework and acts as a catalyst with its concerned people. It aspires for a society free from exploitation, deprivation, malnutrition and oppression, where every individual will be able to get rightful shares of the resources, human rights, fulfill basic needs, where justice will be honored and people shall live in peace. (কারোর নির্দেশে নয়, বরং নিচ থেকে উঠে আসা সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক এমন উন্নয়ন কাঠামোতে সিআইপিডি বিশ্বাস করে, যা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সিআইপিডি এমন সমাজের স্বপ্ন দেখে যেই সমাজ শোষণ, বঞ্চনা, পুষ্টিহীনতা ও নির্যাতন থেকে মুক্ত; যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পদের ন্যায্য হিস্যা পেতে সক্ষম হবে; যেখানে প্রত্যেকে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং লোকজন শান্তিতে বসবাস করতে পারবে)। অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সিআইপিডিকে তাড়িত করেছে সেগুলো হলো,

- ❑ পাহাড়ের উন্নয়ন পদ্ধতি হবে নিচ থেকে উপরে উঠে আসা (bottom up) এবং অংশগ্রহণমূলক;
- ❑ উন্নয়ন এমনভাবে হতে হবে যাতে সমাজ থেকে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও পুষ্টিহীনতা দূর হয়; প্রত্যেকের সম্পদের উপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়;
- ❑ উন্নয়ন এমনভাবে হতে হবে, যাতে সমাজের মানুষ নিজের মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করতে পারে এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়;
- ❑ উন্নয়নের মাধ্যমে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে প্রত্যেকে শান্তিতে থাকতে পারে।

অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে সিআইপিডি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সিআইপিডি বিগত ২৫ বছর ধরে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলায় কাজ করে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ্য, সিআইপিডি'র এই উন্নয়ন রূপকল্প পাহাড়ের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবসম্মত। পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গড়ে উঠার পেছনে একটা প্রেক্ষাপটও আছেঃ সেটা হলো উন্নয়ন নিয়ে পাহাড়ের মানুষদের তিক্ত অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের মানুষ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনেক উন্নয়ন প্রকল্প দেখেছে। সেসব প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পাহাড়ের মানুষদের কাছে সুখকর ছিলো না। এরকম চাপিয়ে দেওয়া ও ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের মধ্যে একটি বড়

উদাহরণ হলো '৬০ দশকে বাস্তবায়িত কাপ্তাই বহুমুখী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের নামে লক্ষাধিক মানুষকে নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। হাজার হাজার একর জমি পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অনেকে এখনো আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে রয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতার পরে বিশেষতঃ '৭৬-এর পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে রাবার বাগান প্রকল্প। সেই প্রকল্পের মাধ্যমেও পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশের যেমন বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে, তেমনিভাবে জুমিয়াদের ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ ও পেশাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এরকম আরো উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়, যেগুলো এই অঞ্চলের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্রথা পদ্ধতি ও ঐতিহ্য বিবেচনায় না নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো। এসব বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফলে এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই পাহাড়ের মানুষদের 'উন্নয়ন' নিয়ে এক ধরনের ভীতিও রয়েছে। এককথায়, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন নীতির কারণে পাহাড়ের মানুষ উন্নয়নের সুফল যথাযথভাবে পায়নি। এই অবস্থায়, চুক্তিত্তোর সময়ে উন্নয়নকামী মানুষের একটা দাবী ছিলো, উপর থেকে নয়, নিচ থেকে উন্নয়ন শুরু করতে হবে (bottom up approach)। অর্থাৎ উন্নয়নের সব প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। এছাড়া দেশের অন্যান্য সমতল অঞ্চলে উন্নয়নের যে মডেল তা পাহাড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই অঞ্চলে ভৌগলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে পার্বত্য চুক্তিত্তোর সময়ে পাহাড়ে জনমুখী উন্নয়ন সূচনা করার জন্য 'নতুন ধারার উন্নয়ন আন্দোলন' শুরু করার দরকার ছিলো। এই প্রেক্ষাপটও সিআইপিডি প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

পাহাড়ের উন্নয়নের বিষয়টি কেবল মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের সাথে সম্পর্কিত নয়। এসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হলে একই সাথে পাহাড়ি আদিবাসী জনগণের সমষ্টিগত ভূমি অধিকার, ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বশাসনের অধিকারও নিশ্চিত করা জরুরি। পাহাড়ের উন্নয়ন ধারণা ও অনুশীলনে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও জোরালো দাবি তুলে ধরতে সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই বড় পটভূমিতে পার্বত্য চুক্তিত্তোর সময়ে সিআইপিডি'র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সিআইপিডি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের উপর সিআইপিডি অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। এসব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সিআইপিডি কেবল উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর উপকার করেনি; এসব প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় যুবদের মধ্যেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে যে ক'টি স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ মডেল নিয়ে কাজ করছে, তাদের মধ্যে সিআইপিডি'র নাম অগ্রগণ্য। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে রাঙ্গামাটি জেলাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণে সিআইপিডি অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

শুধু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নয়, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সিআইপিডি বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা রেখে এসেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়সমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে একত্রিত করার ক্ষেত্রেও সিআইপিডির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

নানা কারণে সারাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছে। একটা বড় কারণ হলো বৈশ্বিক পরিমন্ডলে তহবিলের প্রবাহ কমে যাওয়া। পার্বত্য অঞ্চলের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। পার্বত্য চুক্তির পর পর যে পরিমাণ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গড়ে উঠেছিলো, তাদের অধিকাংশই এখন স্তিমিত অথবা বন্ধ হয়ে গেছে। যে সমস্ত স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ কঠিন সময়েও স্বগৌরবে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে সিআইপিডি অন্যতম। সিআইপিডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার আদর্শিক জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে সিআইপিডি এগিয়ে যাচ্ছে। রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সিআইপিডি তার দীর্ঘ পথ চলার সাফল্য উদযাপন করছে।

এই রজতজয়ন্তীতে সিআইপিডির সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সেই সাথে কামনা করছি, সিআইপিডি দীর্ঘজীবী হোক।

পরিচিতিঃ অশোক কুমার চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, মোনঘর, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি।

E-mail:ashok.chakma@gmail.com

বিকল্প উন্নয়ন ধারণা: পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ জীবন রূপান্তরের জন্য একটি কর্মগবেষণা প্রক্রিয়া

দীপোজ্জল খীসা

"গ্রামবাসীরা নিজেদের নক্সায় কমিউনিটি সেন্টার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি করছে। এই কেন্দ্রের দেওয়ালের চারিপাশে রাখা হয়েছে তাদের জাতির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ ও বাদ্যযন্ত্র যেমন- হেঙগরং, দুদুক, শিঙা, বাঁশি ইত্যাদি। সংগ্রহে রাখা হয়েছে তাদের জাতির বিলুপ্ত প্রায় ব্যবহার্য সামগ্রী ও বিভিন্ন লেখকের লেখা বই-পুস্তক। শুধু প্রদর্শনীর জন্য নয় বরং গ্রামের ছেলে-মেয়েদের ব্যবহারের জন্য, শেখার জন্য। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের জাতিগত সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে এবং মানবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। কেন্দ্রটিও খোলা-মেলাভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন কেন্দ্রের ভিতরে বসে বাইরের কোমল হাওয়া উপভোগ করা যায়। গ্রামবাসীরা একসাথে বসে আলোচনা করতে পারে। সংস্কৃতিমনা এই গ্রামের গ্রামবাসীরা প্রতি বছরই ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিঝু উৎসব পালন করেন। এ উৎসবে প্রতিবেশী গ্রামের গ্রামবাসীরাও অংশ নেয়, অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। গ্রামবাসীরা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী পারস্পারিক সহযোগিতার অন্যতম প্রতীক 'মালেইয়া' প্রথা পুণঃ-প্রচলন করেছে। ইতিমধ্যে গ্রামের নারীরা সংগঠন তৈরি করে মহিলা অধিদপ্তরের কাছ থেকে নিবন্ধন নিয়েছে। নারী সংগঠনের আওতায় সকল নারী সদস্যদের স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন। গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের একজন নারী নেত্রীকে নারী কার্বারীও করা হয়েছে। লিঙ্গবৈষম্য কমানোর জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে সম কাজে সম মজুরী নিশ্চিত করেছে। তাছাড়া, গ্রামের জমি চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনী সেচ ব্যবস্থা সংস্কার করছে। সেচ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য পরিকল্পনাও রয়েছে। গ্রামের পানির উৎস ধরে রাখার জন্য গ্রামের ছড়া ও ঝর্ণার উৎসগুলো পরিচর্যা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ রয়েছে। এটি রাঙ্গামাটি জেলার বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের মগ পাড়া নামক একটি গ্রাম। এই গ্রামের গ্রামবাসীদের উন্নয়ন স্বপ্ন রয়েছে। তারা তাদের গ্রামকে একটি লিঙ্গ ও শ্রেণি বৈষম্যহীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী গ্রাম হিসেবে দেখতে চায়। তারা গ্রামে যৌথভাবে বসবাস করতে চায়। একে অপরকে সহযোগিতার ভিত্তিতে থাকতে চায়। তাদের সামাজিক ও উন্নয়ন কাজও যৌথভাবে সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে পরিচালনা করতে চায়।

"বিলাইছড়ি পাংখোয়া পাড়ার গ্রামের নারীরা তাদের জাতির ঐতিহ্যবাহী পোষাক উৎপাদন করছেন। এই পোষাক তারা নিজেরা ব্যবহার করছেন এবং বাইরে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হচ্ছেন। এক দশক আগে শুধু গুটিকয়েক নারী এ কাজে পারদর্শী থাকলেও বর্তমানে গ্রামের অনেক নারী এ কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন। গ্রামের নারী সংগঠনের উদ্যোগে গৃহীত বুনন কার্যক্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু বুনন দল (যেমন, "লতা পাহাড়" ও "গন্ডা ছড়া") গঠন হয়েছে। নিজেদের জাতির ঐতিহ্যবাহী পোষাক তৈরি করা শেখার অভিপ্রায়ে গ্রামের নারীরা এক সময় বুনন কার্যক্রমটি শুরু করেছিলেন। বর্তমানে নারী সমিতি গ্রামে একটি তাঁত কল স্থাপন করেছে। এই তাঁত কল দিয়ে গ্রামের নারীরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী কাপড় তৈরি করেন। তারা এই শিল্পের সাথে যুক্ত নারীদের নিয়ে একটি তাঁত শিল্প সমবায় সমিতিও গঠন করেছেন। আইনী স্বীকৃতির জন্য সমবায় অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশনও নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গ্রামের নারী সংগঠনের সদস্যরা গ্রামে একজন নারী কার্বারী নিয়োগ দেওয়া ও নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে বর্তমানে বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের কার্যক্রম, ঘরে ঘরে নিরাপদ পানি ও সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, গ্রামের অভ্যন্তরে চলাচলের রাস্তা ও সিঁড়ি তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

"খাগড়াছড়ির কুমারধন রোয়াজা পাড়ার গ্রামবাসীরা গ্রাম উন্নয়ন কাজ করার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাড়া উন্নয়ন কমিটি, গ্রামের শিশু ও যুবদের মানবিক বিকাশের জন্য যুব সংগঠন ও নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য খুমপুই মহিলা সমিতি কাজ করছে। সংগঠনসমূহ একে অপরের মধ্যে সমন্বয় রেখে তাদের কাজ সম্পাদন করছে। ইয়াকবাকসা যুব সংগঠন গ্রামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা জেলা গ্রন্থাগার থেকে রেজিস্ট্রেশনও নিয়েছে। এই লাইব্রেরীতে ৩০০-এর অধিক বই, সাংস্কৃতিক সাজ-সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র (যেমন, হারমোনিয়াম, তবলা, হাম ইত্যাদি), কম্পিউটার, প্রিন্টার ও মাল্টিমিডিয়া রয়েছে। লাইব্রেরীটি পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা রয়েছে। লাইব্রেরীতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বই পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত নাচ ও গান শিখে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি-কোচিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে ২০ জনের অধিক মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

রয়েছে। যুব সংগঠন পরিচালনার জন্য একটা তহবিলও রয়েছে। গ্রামের নারীদেরও নেতৃত্ব দক্ষতা বেড়েছে। তারা বিভিন্ন সভায় সাবলিলভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছেন। তারা নিজেরা খুমপুই মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনা কাজ করছেন। অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন। সভার কার্যবিবরণী লিখছেন। সংগঠনের তহবিলের হিসাব পরিচালনা করছেন। সামাজিক ও প্রথাগত বিচার কাজেও অংশগ্রহণ করছেন। প্রথাগত বিচার প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশেষতঃ শূকর পালন, সেলাই ও রিনাই রিসা বুনে বিক্রি করে পারিবারিক আয়ে সহায়তা করছেন। মহিলা সমিতির এক সদস্যকে গ্রামে নারী কার্বারীও করা হয়েছে। তাদের একটা তহবিলও রয়েছে। তহবিলের টাকা সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম চালায়। পাড়া উন্নয়ন কমিটি গ্রামের সভা ও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জেলা পরিষদের সহায়তায় একটি সেন্টার তৈরি করেছে। তারা প্রতি বৎসর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার মাধ্যমে বৈস্যু উদযাপন করছেন।

"খ্যাংদং পাড়া গ্রামেও চারটি গ্রাম সংগঠন রয়েছে। এগুলো হলো পাড়া উন্নয়ন কিমিটি (পিডিসি), নারী উন্নয়ন কল্যাণ সমিতি, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও হ্লারং যুব কমিটি। পিডিসির নেতৃত্বে গ্রামে দীর্ঘমেয়াদি ভিশন প্লান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামবাসীরা গ্রামে সভা ও অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য একটি রিসোর্স সেন্টার তৈরি করেছেন। নারী সমিতি তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও পরিবারিক আয় বাড়ানোর জন্য গরু ও হাসমুরগি পালন করছেন। উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ি শহরের পাশে এই গ্রামের লোকজন এখন দিনমজুরীর পরিবর্তে গরু পালন, দুধ উৎপাদন ও বিক্রি করে পরিবারের আয় বাড়াচ্ছে। সুদক্ষ নারী নেতৃত্ব কর্তৃক পরিচালিত এ নারী সমিতি তাঁদের সদস্যদের দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল পরিচালনা করছেন। বিভিন্ন জাতীয় ও অর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সচেতন করছেন। ইতিমধ্যে নারী উন্নয়ন কল্যাণ সমিতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে রেজিস্ট্রেশনও নিয়েছে। তাছাড়া, গ্রামের শিক্ষা ভিশন ও নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি কাজ করছে। শিক্ষা কমিটি শিক্ষার জন্য ছাত্র ও অভিভাবকদের ঋণ, শিক্ষা বৃত্তি ও উপকরণ প্রদান করছে। হ্লারং যুব কমিটিও শিশু-কিশোরদের মানবিক বিকাশের সক্ষমতা জন্য কাজ করছে। তারা একটি লাইব্রেরী পরিচালনা করছে। তাছাড়া, গ্রামবাসীরা মারমা ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবছর সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করেন।

"নোয়াপাড়া বান্দরবান জেলার ম্রো জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি গ্রাম। মূল সড়ক হতে গ্রামের প্রবেশ পথ পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা করা হয়েছে। গ্রামের অভ্যন্তরে বসানো হয়েছে বেতের তৈরি ডাষ্টবিন। শুকরও পালন করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে। গ্রামে গ্রীষ্মকালে পানির উৎস শুকিয়ে যায়, ফলে পানির সংকট দেখা দেয়। গ্রামবাসীরা পুরো বছর গ্রামের সকলের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পানি ধরে রাখতে উদ্যোগ নেয়। তারা নিয়মিত পানির উৎস পরিষ্কার করেন। পানির ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত পাইপগুলো নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ছড়ার উৎসে পানি সংরক্ষণকারী গাছ রোপন করেছেন। পানির ট্যাংকের সংখ্যা একটি থেকে তিনটিতে উন্নীত করেছেন। একটি ট্যাংক ব্যবহার করেন খাবার পানির জন্য আর বাকী দুইটি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য। পানি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি তহবিল রয়েছে। কর্মগবেষণা কার্যক্রম শুরুর দিকে গ্রামে কোনো স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল না। বর্তমানে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের ফলে গ্রামবাসীরা শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করেছেন। গ্রামের শিক্ষা কমিটি শিক্ষা তহবিল সৃষ্টি করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার গুনগতমান বাড়ানোর জন্য বেতনধারী একজন শিক্ষক রেখেছেন। যিনি ছাত্রদের নিয়মিত পড়ান। এ সব কাজ গ্রামের পাড়া উন্নয়ন কমিটি সম্পাদন করেছে। এই কমিটির অধীনে মোট পাঁচটি উপ-কমিটি/দল রয়েছে। সেগুলো হল- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি, যুব কমিটি, ঐতিহ্যবাহী বীজ সংরক্ষণ ও মী মুট (মুঠ চাল) কমিটি এবং সাংস্কৃতিক দল। এ সকল কমিটি পাড়া উন্নয়ন কমিটির নিকট জবাবদিহি করে। তাছাড়া, প্রত্যেক কমিটি/সংগঠনের ২/৩ জনকে পাড়া উন্নয়ন কমিটির সদস্য রাখা হয়েছে। প্রত্যেক সংগঠন নিজেদের দায়িত্ব অনুযায়ী গ্রামের উন্নয়নের কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। গ্রামের সকল উন্নয়ন কাজ পাড়া উন্নয়ন কমিটির সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয়। গ্রামবাসীরা একটি রির্সোস সেন্টার তৈরি করেছেন। গ্রামবাসীদের উৎপাদিত ফল সংরক্ষণের জন্য একটি হিমাগারও স্থাপন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক দলটি যুবাদেরকে গ্রামের একমাত্র প্রবীণ কারিগর থেকে তাদের জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বাঁশি তৈরির শিক্ষা দিচ্ছেন। বাঁশি তৈরির জন্য প্রয়োজনী বাঁশ ও গাছ সংগ্রহ করে গ্রামে রোপন করেছেন। এ ছাড়াও ছাত্রদের মাতৃভাষা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।"[২]

২. উন্নয়ন সহায়ক, যারা গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত গ্রামবাসীদের সাথে কাজ করেন, তাদের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামগুলোর উন্নয়নের অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১০ - ২৫ এপ্রিল ২০২৩।

গ্রামগুলোর এ উদ্যোগগুলো অনেকের মনে হতে পারে খুবই নগন্য। কিন্তু গ্রামের এ ধরণের ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রামে পরিবর্তনের হওয়া দিচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলায় এ ধরণের মোট ২৭টি গ্রাম রয়েছে যেখানে ২০০৯-১০ সালের দিকে সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলাপমেন্ট (সিআইপিডি) ও তার সহযোগী সংগঠন খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএমকেএস) এর সাথে "বিকল্প উন্নয়ন" ধারণা নিয়ে কর্মগবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। লুসাই জাতি বাদে পার্বত্য অঞ্চলের বাকি সকল জাতিগোষ্ঠীকেই এই প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, লুসাই জাতিগোষ্ঠি অধ্যুষিত গ্রাম না থাকায় কার্যক্রমের সাথে এই জাতিগোষ্ঠী অংশগ্রহণ রাখা সম্ভব হয়নি। এ কর্মগবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে সিআইপিডি, কেএমকেএস ও টিডিও এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০৯-১০ সালে কর্মগবেষণা কর্মশালার সময়ের পরে এ গ্রামগুলোর অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম ব্যবস্থাপনা পুণঃবিন্যাস হয়েছে, গ্রাম সংগঠন ও নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হয়েছে, যুব ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, গ্রামের কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানবিক বিকাশের জন্য লাইব্রেরী ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, উচ্চ শিক্ষার জন্য সংহতি তহবিল তৈরি হয়েছে, সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনৈতিক কাজে নারী অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বন ও পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি পরিষেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামে অবকাঠামো (যেমন কমিউনিটি সেন্টার, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি) গড়ে উঠেছে। এসবই গ্রামে পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ। গ্রামের অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'বিকল্প উন্নয়ন ধারণা' নিয়ে কর্মগবেষণার অবশ্যই একটা বড় প্রভাব রয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন নিয়ে স্বপ্ন রয়েছে। আমরা যদি এই স্বপ্নকে পরিকল্পনায় রূপান্তর করতে সহায়তা করি তাহলে তারা এই স্বপ্ন অর্জনের জন্য সক্রিয়া ভূমিকা নিবে। তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সম্পদ দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্বপ্রনোদিত হয়ে উদ্যোগ নেয়।

এই বিশ্বাস নিয়ে বাস্তবিকভাবে আমরা গ্রাম সংগঠনের নেতাদের সাথে গ্রামের অবস্থা বিশ্লেষণ এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (গ্রামের সমাজ স্বপ্ন) তৈরির জন্য গ্রামে গ্রামবাসীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মশালা করেছি। পরবর্তীতে এ পরিকল্পনা বাস্তায়নের জন্য গ্রাম সংগঠন তৈরীতে সহায়তা করেছি, সচেতনা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, পরিকল্পনা পর্যালোচনা সভা, নেতৃত্বের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষাসফর, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে সংগঠনের নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করেছি। এই কর্মগবেষণার প্রক্রিয়া থেকে গ্রামবাসীদের কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা বা বস্তুগত সম্পদ হস্তান্তর করিনি। গ্রামের নেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি, যেন তারা নিজেদের উদ্যোগে যৌথভাবে ও পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

"বিকল্প উন্নয়ন" ধারণাটি উন্নয়নের নতুন কোনো উন্নয়ন তত্ত্ব নয়। এটি উন্নয়নের একটি পরিপূরক ও সমন্বিত ধারণা। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর মূলত এ ধারণার কথা পার্বত্য অঞ্চলে আলোচনায় আসে। চুক্তির পর পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। তখন উন্নয়ন নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বক্তব্য ছিল, আমাদের জীবনাচার, আমাদের পরিচিতি, আমাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিকভাবে ভালো থাকার ভিত্তিতেই আমরা উন্নয়ন করতে চায় (Tebtebba Foundation, ২০০০)। এ সময় জাতিসংগের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সহ অনেক দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলে কাজ করার জন্য তাদের নিজেদের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু, দেশী-বিদেশী সংস্থার উন্নয়ন উদ্যোগ পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃত্বের মধ্যে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করে (চাকমা, ২০০২)। তারা এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহকে চাপিয়ে দেওয়ার উন্নয়ন হিসেবে অভিহিত করেন (চাকমা, ২০০২)। এই উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও পরিবেশের প্রতি অসংবেদনশীল বলে সমালোচনা করেন। তারা বলেন, প্রকল্পগুলোতে এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন হয়নি এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে অবহেলা করা হয়েছে (Roy, ২০০৩)। সর্বোপরি, এ সকল প্রকল্পের ফলে এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে (চাকমা, ২০০২)।

কিন্তু, সে সময় পার্বত্য অঞ্চলে সকলের গ্রহণযোগ্য জোরালো কোনো উন্নয়ন ধারণা ও কৌশল ছিল না। ১৯৯৮ সালে "রাঙ্গামাটি ঘোষণা" এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। উন্নয়নের জন্য জোর দেয়া হয়েছিল

পার্বত্য চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের উপরে। তাছাড়া এখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে উন্নয়নের নীতি ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো এখানেও অস্পষ্ট ছিল। এরপর স্থানীয় এনজিওদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম জনমুখী উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের নেতৃত্ব বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তির জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হতে হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও পরিবেশের প্রতি সম্মান করতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহকে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডের সাথে সংগতি থাকতে হবে। এ জন্য হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের নেতৃত্ব দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার কাছে এডভোকেসী করে। তখনও পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এ শুণ্যতার অনুভূতি থেকে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের নেতৃত্ব তার কিছু সদস্য সংস্থার সাথে পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম পর্যায়ে একটা টেকসই উন্নয়ন মডেলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'বিকল্প উন্নয়ন' এর জন্য কর্মগবেষণা কার্যক্রমটি শুরু করার উদ্যোগ নেয়। কর্মগবেষণা প্রক্রিয়া পরিচালনার শুরুতে ২০০৫ সালের দিকে তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নারী নেত্রী, যুব সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়ে পরামর্শ সভা ও কর্মশালা করা হয়। এ সকল সভা ও কর্মশালায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর প্রচুর বিতর্ক হয়। অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। এ সকল পরামর্শ সভা ও কর্মশালার আলোচনার পর পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চারটি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো হলো স্ব-নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা, ভূমি ও সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহার, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবে-ধ চর্চা এবং ভূখন্ডগত পরিচিতি বা স্বাতন্ত্র্যতা। এটিই বিকল্প উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে এখনো কাজ করছে।

২০০৬ সালে শুরু হয় সহায়কদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম। এ ফলে জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে এক দল উন্নয়ন সহায়ক তৈরি হয়। এই উন্নয়ন সহায়করা দারিদ্র অবস্থা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, প্রচলিত উন্নয়ন ধারণা ও কৌশল, বিকল্প উন্নয়ন ধারণা, জেন্ডার, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি, দ্বন্দ্ব রূপান্তর ও শান্তির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। এই উন্নয়ন সহায়ক দলের সদস্যরাই বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্মগবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০৯-১০ সালের দিকে এ সকল উন্নয়ন সহায়করা গ্রাম পর্যায়ে গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা ও অংশগ্রহণমূলক কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বিষয় কর্মশালা পরিচালনা করে। এ কর্মশালায় গ্রামের স্বপ্ন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হয়। ২০১১ সাল থেকে উন্নয়ন সহায়করা এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গ্রামের নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছেন। পুরো প্রক্রিয়াটি অংশগ্রহণমূলক, জনমুখী এবং স্বপ্ননির্ভর। গ্রামবাসীদের সাথে অংশগ্রহণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

উন্নয়ন সহায়ক দলও এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন, তাদের কাজ যৌথভাবে পর্যালোচনা করেন এবং এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। এভাবে দীর্ঘ দশ বছরের অধিক সময় কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১৫ সালে কর্মগবেষণাকারী দলের সদস্যরা 'বিকল্প উন্নয়ন ধারণা' গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে। যাকে 'বিকল্প উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন ফ্রেমওয়ার্ক' হিসেবে পরিচিতি করানো হয়। এটি পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়ন নিয়ে কর্মরত অভিজ্ঞ কর্মী ও সহায়কদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের পর তৈরি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত সহায়কদের কাছ থেকেও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় এ এলাকার মানুষ কীভাবে সুখী জীবন যাপন করতে পারে? কী প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে এ এলাকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে? এ ধরণের কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফ্রেমওয়ার্কটি মূলত, বিকল্প উন্নয়ন ধারণা গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। এ ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে গ্রামবাসীরা একটি দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। এই দারিদ্রাবস্থা বিশ্লেষণ করা ও গ্রামবাসীদের বিকল্প উন্নয়ন ধারণার নীতিসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে গ্রামবাসীদের উন্নয়ন স্বপ্ন নির্ধারণ করা। উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব তৈরি করার জন্য গ্রামের উন্নয়ন অংশীদার ও গ্রামের নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যাতে গ্রামে শক্তিশালী গ্রাম সংগঠন গড়ে উঠে। গ্রাম সংগঠনে কর্তৃক আদর্শ গ্রামের রূপকল্প তৈরিতে গ্রামের নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর ও যুবসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গ্রামের নেতৃবৃন্দকে রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সহায়তার জন্য প্রয়োজনী লবি ও এডভোকেসী করা। এই প্রক্রিয়ায় মূল লক্ষ্য হলো গ্রামে সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটানো।

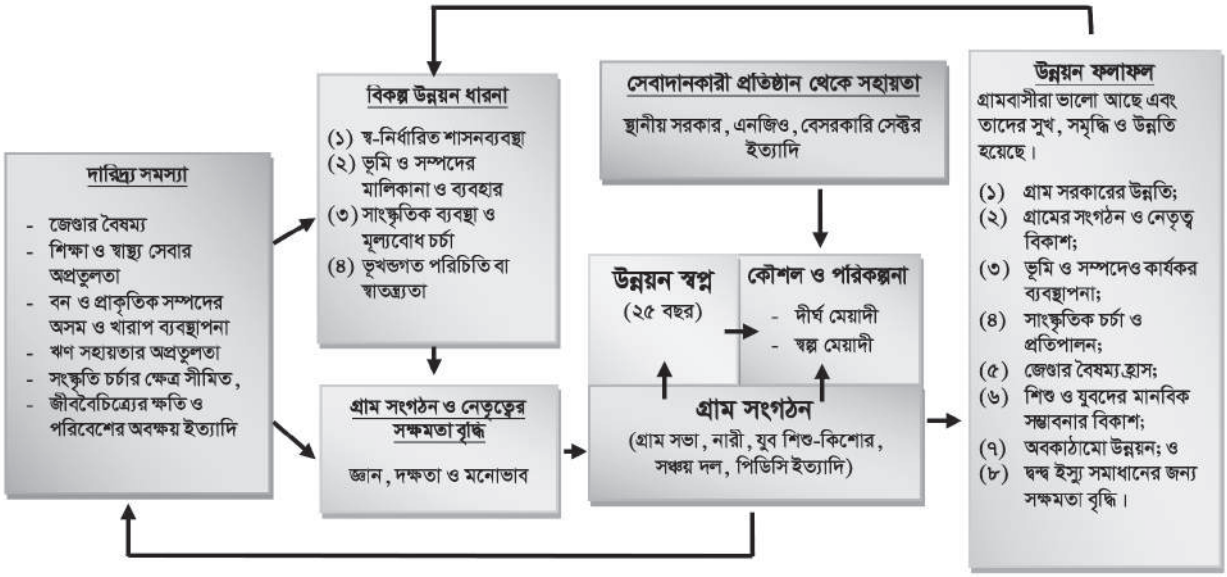

চিত্র ১: বিকল্প উন্নয়ন ধারণার ভিত্তিতে আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার ফ্রেমওয়ার্ক

'বিকল্প উন্নয়ন ধারণা' বাস্তবায়ন ফ্রেমওয়ার্কের প্রধান উপাদানসমূহ হলো- (১) দারিদ্র্য সমস্যা; (২) বিকল্প উন্নয়ন ধারণা; (৩) সহায়কদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (৪) উন্নয়ন স্বপ্ন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও গ্রাম সংগঠন; (৫) সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা লবি ও এডভোকেসী; ও (৬) কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল।

(১) দারিদ্র সমস্যা:

দারিদ্র্য সমস্যা হলো গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক অবস্থা যা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। গ্রামবাসীদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণে কর্মগবেষণার টুলস্ (যেমন, মেট্রিক্স, চার্ট, ক্ষমতার মানচিত্র, সামাজিক মানচিত্র ইত্যাদি) ব্যবহার করে গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করা। এ তথ্যগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামের দারিদ্র্য সমস্যা বা ইস্যু চিহ্নিত করা।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক ভাবে ২৭টি গ্রামের অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদনে মূলত নারীর প্রতি বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অসম ও খারাপ ব্যবস্থাপনা, ঋণ সহায়তার অপ্রতুলতা, সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র সীমিত, সর্বোপরি, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি ও পরিবেশের অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়গুলো দারিদ্র্যের সমস্যা হিসেবে উঠে আসে।

(২) বিকল্প উন্নয়ন ধারণা:

২০০৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করে নির্ধারিত পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চারটি মূলনীতি ও মূল্যবোধকে এখানে বিকল্প উন্নয়ন ধারণা বলা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীদের নিজস্ব ভাবনা রয়েছে। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন ভাবনা ও বিকল্প উন্নয়ন ধারণার ভিত্তিতেই গ্রামে সমাজ স্বপ্ন তৈরি করা। বিকল্প উন্নয়ন ধারণার মূলনীতিগুলো হলো -

ক) স্ব-নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা: উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীরা (বিশেষত গ্রামবাসীরা) নিজেদের উন্নয়নের অগ্রাধিকার স্বাধীনভাবে নিজেরাই ঠিক করবে। তাঁদের উন্নয়ন স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি নিজেরাই নির্ধারণ করবে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

খ) ভূমি ও সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহার: অতীতে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ভূমি ও সম্পদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ধরণ যৌথ ছিল। কালের বির্বতনে এই যৌথতা হারিয়া যাচ্ছে। তাই, গ্রামে যৌথ মালিকানাধীন ভূমি ও অন্যান্য সম্পদগুলো চিহ্নিত করা। গ্রামবাসীর কল্যাণে এ সকল সম্পদের যৌথ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো।

গ) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ চর্চা দেশের সবচেয়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল পার্বত্য এলাকা। এখানে সবচেয়ে বেশি জাতির সমাগম রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, প্রথা ও চর্চা রয়েছে যা ব্যবহার করে তারা জীবন-ধারণ করছে। এগুলো শুধুমাত্র তাদের জাতির সম্পদ নয়, পুরো দেশের তথা মানবজাতির সম্পদ। এগুলোর প্রসার ও উন্নয়ন করা। গ্রামবাসীদের কল্যাণে ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এ সকল জ্ঞান ও চর্চাগুলোর প্রতি সম্মান, উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবিত করা।

ঘ) ভূখণ্ডগত পরিচিত: ভৌগলিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যপুর্ণ এলাকা হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলে বন ও পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন জাতির বসবাস রয়েছে। এ অঞ্চলে বন ও পাহাড়ের সাথে এখানকার জাতির সংস্কৃতি ও পরিচিত মিশে আছে। গ্রাম পর্যায়ে গ্রামবাসীদের সাথে বন ও পাহাড়ের বৈচিত্র্যতা চিহ্নিত করা ও তা উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও মূল্যবোধ চর্চার বিষয়সমূহও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। চর্চার মাধ্যমেই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও মূল্যবোধের উন্নয়ন ও প্রসার সম্ভব। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ও কর্মক্ষেত্রে সমতা, যৌথতা, সহযোগিতা ও সংহতি ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ চর্চার প্রসার ও উন্নয়ন করা অপরিহার্য।

(৩) গ্রাম সংগঠন ও নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি:
মানুষের সঠিক ও বাস্তব সামর্থ্য তার 'সম্পদ'-এর উপর নির্ভর করে। মানুষ তাঁর সম্পদ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত জীবিকার ফলাফল অর্জন করতে পারে। কিন্তু, বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামর্থ্যের মূল হলো গ্রাম সংগঠন ও নেতৃত্ব। যদি গ্রামের নেতৃত্বের মধ্যে গ্রাম সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য বা জ্ঞান থাকে, তাহলেই তাঁরা গ্রাম সংগঠন পরিচালনা ও গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন। গ্রামের মধ্যে সহযোগিতা, সহভাগিতা ও যৌথতা চর্চা থাকলে তা গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাই সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রাম উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীদের উপস্থিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের সমন্বয় ও ব্যবহার করা। স্ব-উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সমাজ স্বপ্ন বিনির্মাণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা। পাশাপাশি, সক্ষমতা বৃদ্ধিও আরেকটি লক্ষ্য হলো গ্রাম উন্নয়ন স্বপ্নের সাথে বিশ্বের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সংগতি রাখা। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে উন্নয়ন ইস্যু ও বিতর্ক নিয়ে গ্রামবাসীদের তথ্য সরবরাহ ও আলোচনা করা।

(৪) গ্রাম সংগঠনের জন্য উন্নয়ন স্বপ্ন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন:
গ্রামে নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, শিশু-কিশোর দল, উন্নয়ন সমিতি/কমিটি, পেশা ভিত্তিক সমিতি ইত্যাদি রয়েছে। সংগঠনের নেতাদের নিয়ে গ্রামের উন্নয়ন স্বপ্ন তৈরি করা। উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম সংগঠনের মধ্যে কর্ম বন্টন করা। গ্রাম উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। গ্রাম সংগঠনের উন্নয়ন স্বপ্ন মূলত গ্রামবাসী কর্তৃক নির্ধারিত গ্রামের দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

(৫) সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তার জন্য লবি ও এডভোকেসী:
গ্রাম উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অনেক সংস্থা কাজ করছে। তারা স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ঋণ প্রদান, গবাদি পশুপালন, মাছচাষ, হাস-মুরগী পালনসহ নানান ধরণের কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সহায়তা করছে। গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ সকল সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্রাম উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রামের সংগঠনগুলোর নিজস্ব উদ্যোগ। এটি গ্রামের নেতৃত্বকে গ্রাম উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়নের আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করবে।

(৬) উন্নয়ন ফলাফল:
বিকল্প উন্নয়ন ধারণা নিয়ে কর্মগবেষণার সময় বিভিন্ন জাতির গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ করা হয়। প্রশ্ন করা হয়- উন্নয়ন বলতে তারা কী বুঝেন? তাদের ভাষায় 'উন্নয়ন' শব্দটির মানে কি? অধিকাংশ জাতির গ্রামবাসীরা বলেন, উন্নয়ন মানে তাদের মতে হলো 'ভালো থাকা'। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ভালো থাকা। তারা আমাদেরকে জানান, ভালো থাকতে গেলে মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতির প্রাণি ও জীব-জন্তুদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হবে। বাঁচতে হবে যৌথ ও পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে। আমরা গ্রামে গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করি। দেখা যায়, অধিকাংশ জাতির লোকেরা সাধারণত ভোগের জন্যই উৎপাদন করেন। বাজারের জন্য নয়। তাদের সাথে আলোচনা করে আমরা

জানতে পারি, উদ্বৃত্ত তাঁরা আগে ব্যবহার করতেন সামাজিক ভারসাম্য ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য। ভূমি ব্যবস্থাপনার ধরণ হলো প্রথাগত। ভূমির মালিকানার ধারণা যৌথ। তাঁরা জানান, কয়েক দশক আগেও এ অঞ্চলের ভূমি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ ও বিক্রির বিষয় ছিল না। দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল হিসেবে সাধারণত দেখতে পায় ভিন্নতা ও পার্থক্যকে গ্রহণ করার সহজ মানসিকতা। ভিন্নতা ও পার্থক্যের মাঝে বৈষম্য না খুঁজে বরং ভিন্নতাকে সম্মান করার প্রবণতা। রয়েছে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী সহ অন্যান্য সেক্টরের সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

কিন্তু, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এ ধারণাগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামবাসীরা গ্রামে যৌথতা ও সহযোগিতার বদলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জাতি সমূহের মধ্যে ভোগ ও মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমি দ্রুত ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের সাথে প্রকৃতি, প্রাণি ও জীব-জন্তুদের সঙ্গতি বিনষ্ট হচ্ছে। বাজার ও মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে। জাতি সমূহের ভিন্নতা ও পার্থক্যের মধ্যে অনেকে বৈষম্য দেখছে। বিপরীতে বিকল্প উন্নয়ন নিয়ে কর্মগবেষণা দলের পক্ষ থেকে ২০১৩-১৪ সালের দিকে গ্রামবাসীদের ভালো থাকার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। উন্নয়ন সহায়ক দল গ্রামের নেতাদের অংশগ্রহণে বেশ কিছু কর্মশালা আয়োজন করেন। যেখানে গ্রামবাসীদের ভালো থাকার সূচকগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কর্মশালার ফলাফল হিসেবে 'আদর্শ গ্রামের একটি রূপরেখা' পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতিকে আদর্শ গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করা হয়। তাছাড়া, এ রূপরেখায় আটটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেগুলো হল- (১) গ্রাম সরকারের উন্নতি; (২) গ্রামের সংগঠন ও নেতৃত্ব বিকাশ; (৩) ভূমি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা; (৪) সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিপালন; (৫) জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস; (৬) শিশু ও যুবদের মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ; (৭) অবকাঠামো উন্নয়ন; ও (৮) দ্বন্দ্ব ইস্যু সমাধানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি। বর্তমানে এগুলো বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, বিকল্প উন্নয়ন ধারণাটি পার্বত্য অঞ্চলের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা, কাজের ফলাফল যৌথভাবে পর্যালোচনা করা এবং কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে। এই ধারণাটি বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২, ৫, ১৫ ও ১৬ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২-এ ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার করা, লক্ষ্যমাত্রা ৫-এ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা, লক্ষ্যমাত্রা ১৫ - তে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন, টেকসই পদ্ধতিতে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমির গুণগত মান বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করা এবং লক্ষ্যমাত্রা ১৬ - তে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ করার কথা রয়েছে। তাছাড়া, ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক নীতিমালার সাথে ধারণাটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, বিকল্প উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে আমরা মনে করি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে প্রাণ-জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। স্থানীয়দের সমাজ স্বপ্ন অর্ন্তভূক্ত করা। স্থানীয় জ্ঞান, পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান ও কার্যকর ব্যবহার করে এ উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

আর্থিক সহায়তা ও বস্তুগত সম্পদ হস্তান্তর না করে/না দিয়েও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভব। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন স্বপ্নকে বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় রূপান্তর করতে সহায়তা করলে গ্রামবাসীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে উৎসাহী হয়। আর্থিক সহায়তা বা সহজেই পাওয়া সম্পদ অনেক সময় গ্রামবাসীদের ক্ষমতায়িত করার পরিবর্তে নির্ভরশীল গড়ে তুলতে পারে। তাছাড়া, গ্রাম উন্নয়ন কাজের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে শুধুমাত্র এককালীন প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এজন্য প্রয়োজন উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার।

সর্বোপরি, গ্রামবাসীদের সাথে উন্নয়নের অংশীদারত্বের প্রধান শর্ত হওয়া প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতামূলক। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন কাজের উপর সক্ষমতার প্রতি ভরসা রাখতে হবে। স্বপ্ন অর্জনের চেষ্টার পাশাপাশি সততা, যত্নশীলতা,

সহভাগিতা, বহুত্ববাদীতা ইত্যাদি মূল্যবোধ কর্মী ও সংগঠনে বাস্তবিকভাবেই চর্চায় আনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম উন্নয়নের উদ্যোগসমূহকে টেকসই করতে অবশ্যই দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব রূপান্তর ও দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা পন্থাগুলো কর্মী ও সংগঠনের মধ্যে চর্চায় আনা অপরিহার্য।

[প্রবন্ধটির মৌলিক তথ্যগুলো সিআইপিডি, কেএমকেএস ও টিডিও কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্মগবেষণা এবং সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কর্মীদের প্রতিবেদন ও আলোচনা প্রবন্ধটির তথ্যের প্রধান উৎস। এজন্য প্রকল্প কর্মী ও উন্নয়ন সহায়কদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।]

তথ্যসূত্র

চাকমা, ম. ক. (২০০২). পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও মুভমেন্ট প্রসঙ্গে. In M. K. Chakma, আমানি কক, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০২ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা; (পৃষ্টা. ২১-২৯). Rangamati: Hill Tracts NGO Forum.

Roy, C. (2003). Impact of Development. In N. Mohaiemen, Between Ashes and Hope: Chittagong Hill Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism (pp. 89-90). Dhaka: Drishtipat Writters' Collective.

Tebtebba Foundation. (2000). The Chittagong Hill Tracts: The Road to a lasting Peace. Baguio City, Philippines: Tebtebba Foundation.

পরিচিতিঃ উন্নয়নকর্মী ও বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্মগবেষণা টীমের সদস্য। E-mail: dipujjal@gmail.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা

জনলাল চাকমা

পটভূমিঃ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। বর্তমানে এ অঞ্চলটি তিনটি পৃথক জেলায় বিভক্ত হলেও এর ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও নৃতাত্ত্বিক একাত্মতা এত নিবিড় যে এখনো এ অঞ্চলটি এ নামে সমধিক পরিচিত। এখানকার ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অন্যান্য কারণে এখানে কৃষিক্ষেত্রে এখনো আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন হয়নি। আদিবাসী কৃষকরা এখনো সেকেলে হালচাষ ও জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কল ছাড়া এখানে কোনো শিল্প কারখানা নেই। ফলে পার্বত্যবাসীদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ, পাকিস্তান আমলে ছিল সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৬ সালে এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় ও ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে জননিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার পরিবার বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে ও বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং অনুরূপভাবে হাজার হাজার সেটেলার পরিবারদের নিরাপদ এলাকায় বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময়ের অব্যাহত রাজনৈতিক সংকটের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও স্থায়ী বাঙালীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছিল। এই সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি-উৎপাদন, পশুপালন, কুটির শিল্প তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ব্যাহত এবং ব্যাপক বন ধ্বংস, কাঠ পাচার, বন্যপ্রাণি নিধন, মৎস্য শিকার প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্বকালীন এই বাস্তবতার কারণে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ ও অনেক ক্ষেত্রে স্থবির।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে জননিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পার্বত্যবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে তিন দশকের অঘোষিত যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটলে অভ্যন্তরীণ ও ভারতে আশ্রিত জুম্ম উদ্বাস্তুরা নিজ বাস্তু-ভিটায় ফিরে আসতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই উদ্বাস্তু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিদেশী দাতা সংস্থা ও জাতীয় এনজিওসমূহ এগিয়ে আসে। বিশেষ করে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওসমূহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

এনজিও বিষয়ে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিপূর্ব ও চুক্তিত্তোর পরিচালিত কার্যক্রমের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওসমূহকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চুক্তি পূর্বকালীন সময়ে এখানে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইসব সংস্থার দাতব্য ও সেবামূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে এখানে এনজিওসমূহকে দাতব্য সংস্থা হিসাবে অনেকে মূল্যায়ন এবং সেইভাবে সেবামূলক কার্যক্রম প্রত্যাশা করেন। অপরদিকে চুক্তিত্তোর সময়ে বিভিন্ন জাতীয় এনজিও এর ব্যাপক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে এনজিওসমূহকে অনেকে ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এনজিও সম্পর্কে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বর্তমানে এনজিও সম্পর্কে এখানে দ্বৈত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে অনেকে এনজিওসমূহকে মূলত দাতব্য সংস্থা হিসেবে পেতে চান এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এমনকি এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এনজিওসমুহকে কঠোর সমালোচনা করে থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রমঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ববর্তী সময়ে এখানে সকল ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করায় এনজিও কার্যক্রম চালানোর তেমন পরিবেশ ছিল না। এই সময়ে এখানে কয়েকটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা কেবলমাত্র অধিক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ

এলাকায় শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সীমিতভাবে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব সংস্থাসমূহের মধ্যে Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), Pankhua Community Development Association, Rabita-Al-Alam Al Islami Bangladesh, International Islamic Relief Organization, Islamic Relief Committee, Islamic World Committee, Monoghar ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম শুরু হয় নব্বই দশকের প্রথমদিকে। ১৯৯২ সালের শেষের দিকে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং সংলাপ শুরু হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে এবং এনজিওসমূহের কাজ করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে IDF, Green Hill, World Vision, CHCP, Toymu, PAJURECO, Zabarang, Taungya প্রভৃতি স্থানীয় এনজিও বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা সদরে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিন পার্বত্য জেলায় তৃতীয় পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এই পর্যায়ে BRAC, Proshika, গ্রামীণ ব্যাংক, IDF প্রভৃতি জাতীয় এনজিও প্রধানত ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এবং তিন পার্বত্য জেলায় অর্ধ শতাধিক স্থানীয় এনজিও আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে বিভিন্ন জাতিসংঘ, বিদেশী দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা World Food Programme (WFP), UNICEF, UNDP, Europio Union, USAID, DANIDA, CARE-Bangladesh, Wold Vision, Save the Children স্থানীয় এনজিওসমূহকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করে। এইসব দাতা সংস্থার অর্থায়নে ২০০১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে এখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে মৌলিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

নারীর ঋণপ্রাপ্তি ও সচেতনতা সৃষ্টিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে নারীদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। নিজস্ব সম্পত্তি, সামাজিক ও পেশাগত বিশেষ সুযোগ ছাড়া কোনো নারীকে সহজে ঋণ প্রদান করা হয় না। কিন্তু এনজিও এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে নারীরাই প্রধান লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী এবং অনেক এনজিও আবার শুধুমাত্র নারীদের ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসায় নারীদের ঋণগ্রহণের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারী শ্রমের ব্যবহার, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জনে এবং দুঃস্থ নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে এনজিওসমুহ প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে নিঃসন্দেহে।

নারীর ক্ষমতায়নঃ

নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা প্রদান, সামাজিকভাবে নারীদের সমমর্যাদা প্রদান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে সম সুযোগ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আজ বহু সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ, গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক বিচার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব (নারী কার্বারী) উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এনজিওসমূহের এসব কার্যক্রমের ফলে আজ তিন পার্বত্য জেলায় অনেক নারী সংগঠন ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই অবহেলিত পর্যায়ে ছিল। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির সমস্যা খুবই প্রকট। তাছাড়া আরো অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে কোনো সরকারি/বেসরকারি স্কুল নেই এবং সরকারি নীতিমালার ভিত্তিতে এসব অঞ্চলে স্কুল স্থাপনের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বকালীন পরিস্থিতির কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে আভ্যন্তরীণ উদ্ভাস্তু হয়েছে তারা এসব এলাকায় বর্তমানে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পুর্ণভাবে বঞ্চিত ছিল। এসব শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে CARE-Bangladesh ২০০১-২০০৫ সালে (Chittagong Hill tracts Children Opportunities Learning Enhencement-CHOLEN) প্রকল্প, ব্রাক ও প্রশিকা স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে এবং সিএইচসিপি নিজ উদ্যোগে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে। পার্বত্য শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে UNICEF এর পাড়া কেন্দ্রের ভূমিকা সর্বজনবিদিত এবং ২৩৩টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে UNDP-CHTDF যেগুলি ২০২০-২০২৩ সালে সরকারিকরণ করা হয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানঃ

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আজ একটি স্বীকৃত বিষয়। দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই চুক্তির আলোকে জাবারাং, ম্রোচেট, কোডেক, জুনোপহর, কারিতাস আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষাভাষী শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হলে ২০১৬ সালে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। বর্তমানে আদিবাসীদের ভাষার উন্নয়ন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও এনজিও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আদিবাসী মাতৃভাষার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য জাবারাং এর নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরাকে ২০২১ সালে মাতৃভাষা পদক দেওয়া হয়।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে পানীয় জলের সংকট খুব প্রকট। উঁচু পাহাড়ে বসবাসরত আদিবাসীদের পানির অভাব সারা বৎসর বিদ্যমান থাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণত পাহাড়ী ঝরণা বা কুয়ার জল ও শহরাঞ্চলে নলকুপের জল ব্যবহার করা হয়। ২০০১ সালে CIPD এর জরীপে ৬২.০২% লোক নলকুপের জল, ৩৭.৯৮% কুয়া/পাহাড়ী ঝর্ণার জল ব্যবহার করে। জরীপকৃত গ্রামসমূহের মধ্যে এনজিও কার্যক্রমভূক্ত গ্রামসমূহে ৮০% নলকুপের জল ব্যবহার করে। অপরপক্ষে এনজিও কার্যক্রম বর্হিভুত গ্রামসমূহে নলকুপের সুবিধা না থাকায় ৮৩% লোক কুয়া/ঝর্ণার পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সুপেয় পানির সংকট নিরসনের জন্য এনজিওসমূহ প্রথম থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পার্বত্যবাসীদের পানি সমস্যা দূরীকরণে ওয়াটার এইডের সহায়তায় প্রথমে গ্রীণহিল জিএফএস পদ্ধতি চালু করে এবং বর্তমানেও এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন গ্রামে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর হার বৃদ্ধির জন্য ডানিডার সহায়তায় ২০০৫-২০০৬ সালে কয়েকটি স্থানীয় এনজিও হাইসোওয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মূলত: প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে একমাত্র স্থানীয় এনজিওসমূহ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর হার বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মৌজা সামাজিক বন সংরক্ষণ (ভিসিএফ)ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮০% অঞ্চলই বনায়নের উপযোগী এবং এখানে ৩৭০৯.৭৮ বর্গ মাইল সরকারি বনাঞ্চল রয়েছে। কিন্তু এ বনাঞ্চল আজ হুমকির সম্মুখীন। দুর্নীতি, অপরিকল্পিত কাঠ আহরণ, চোরাচালান ইত্যাদি কারণে এ বনাঞ্চল প্রায় উজাড় হয়ে গেছে। এই বনাঞ্চলকে সংরক্ষণ ও অধিক বনাঞ্চল সৃষ্টির আজ অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রাংগামাটি জেলাস্থ টংগ্যা সর্ব প্রথম এই মৌজা বন সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে UNDP-CHTDF এর অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলায় শতাধিক মৌজা সামাজিক বন সংরক্ষণের (ভিসিএফ) প্রচেষ্টা চলছে। বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি ভিসিএফ কার্যক্রমের জন্য তজিংডংকে ২০১৬ সালে "এনার্জি গ্লোব ওর্য়াল্ড" পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

পার্বত্য চট্রগ্রামে এনজিও কার্যক্রমের শুরুতে সুফলভোগীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়নের জন্য জেন্ডার সচেতনতা, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের সামাজিক সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাঃ

তিন পার্বত্য জেলায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্র্যাক ২০০১ থেকে ম্যালেরিয়া চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া Medicine Sans Frontiers (MSF) খাগড়াছড়ি জেলায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। বর্তমানে আল রাবেতা (লংগদু) ও খ্রিষ্টান মিশনারী হাসপাতাল (চন্দ্রঘোনা) চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ আবদান রেখে চলেছে। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এনজিওসমূহ অতিদ্রুত সেবা প্রদান করে আসছে।

জরুরী সেবা প্রদানঃ

প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দূর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসাসহ নানাবিধ মানবিক কার্যক্রমে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে এনজিওসমূহ অতিদ্রুত কার্যক্রম শুরু করতে পারে। ২০০৭-০৮ সালে ইদুঁর বন্যার সময় WFP এর সহায়তায় CIPD, GROUS, ALO তিন পার্বত্য জেলায় ১৩,০০০ পরিবারকে জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। কোভিড-১৯ এর দূর্যোগের সময় UNDP তিন পার্বত্য জেলায় কয়েক হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। ২০১৭ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ভূমিধসের পর সরকারি উদ্যোগের পাশাপশি রেডক্রসসহ বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি পরিস্থিতে এনজিওসমূহ অতিদ্রুত কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

পার্বত্য এনজিওসমূহের দুর্বলতাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির পরে স্থানীয় এনজিওসমূহের আবির্ভাব ঘটে, তাই অভিজ্ঞতার দিক থেকে স্থানীয় এনজিওসমূহের অভিজ্ঞতা খুবই কম বলা যায়। তাছাড়া বর্তমানে কর্মরত সকল স্থানীয় এনজিওসমূহ সম্পূর্ণভাবে দাতা সংস্থাসমূহের অনুদানের উপর নির্ভরশীল, নিজস্ব ফান্ড নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। তাই পার্বত্য চুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় এপর্যন্ত শতাধিক এনজিও নিবন্ধিত হলেও অধিকাংশ সংস্থা কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি। অপরদিকে জাতীয় এনজিওসমূহের অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি পরিচালনার মত আর্থিক সংগতি থাকলেও তাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে-পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনা কৌশল গ্রহণে অক্ষমতা। বর্তমানে অবশ্য জাতীয় এনজিওসমূহ স্থানীয় কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতিগত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করছে।

এনজিও কর্যক্রমের প্রতিবন্ধকতাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষ ও বিপক্ষের মতভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিও কার্যক্রমও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং বিদেশী অনুদান হ্রাস পাওয়ার কারণে এনজিও কার্যক্রম সীমিত হয়ে এসেছে।

উপসংহারঃ

বর্তমানে জাতীয় এনজিও সমূহ ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন, নার্সারী, সবজি চাষ ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও স্থানীয় সংস্থাসমুহ গবেষণা, পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষা, বনায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তবে বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় এনজিওসমূহের কার্যক্রম খুবই সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষ করে তহবিলের অভাবে অধিকাংশ স্থানীয় এনজিও ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও এর ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এখানে কারোর দ্বিমত নেই। পার্বত্যবাসীরা অবশ্যই আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওসমূহের সম্পৃক্ততাকে সর্বাধিক কামনা করে।

পরিচিতিঃ বিশিষ্ট গবেষক ও উন্নয়নকর্মী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি।

E-mail: cipdcht@gmail.com

Our Donors and Partners

bff
Brot für die Welt
care Bangladesh
codec
eed Evangelischer Entwicklungsdienst
HELEN KELLER INTL
IRG International Resources Group (IRG)
KMKS
MALEYA Foundation
Manusher Jonno Foundation
NGO FORUM FOR PUBLIC HEALTH
JPIC OBLATES
OXFAM
PKSF
TEBTEBBA
UNDP Bangladesh
unicef
THE WORLD BANK IBRD • IDA
WFP